ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

৬১ বর্ষ ৩৫ সংখ্যা ।। ২০ বৈশাখ, ১৪১৬ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১১) ৪ মে, ২০০৯ ।। Website : www.eswastika.com

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

নির্বাচন ঃ উত্তরবঙ্গ

চার্চের গোপন ফতোয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। উত্তরবঙ্গের ধর্মান্তরিত আদিবাসীদের নির্দিষ্ট সন্তর্পণে ফতোয়া দিচ্ছে বিভিন্ন চার্চ। ডুয়ার্সের বিভিন্ন চা-বাগানে ব্যান্ডের ফাদারদের ভোটের ময়দানে অতি খৃস্টান ধর্মে নিয়ে আসা আদিবাসীদের তা নিশ্চিত করতেই এই সক্রিয়তা।

জোয়াকিম বাকলা

অন্তত ছটি লোকসভা আসনে প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার জন্য অতি দার্জিলিং-এর পাহাড়, তরাই এবং ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা চার্চের সক্রিয় ভূমিকা নিতে দেখা যাচ্ছে। ভোট যাতে চার্চের হুকুম মেনেই পড়ে ডুয়ার্স ও তরাইয়ের প্রায় ১৭০টি চা বাগানে চার্চের প্রাধান্য নিয়ে চিন্তিত এলাকাবাসী। এতদিন উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং দক্ষিণে কেরলের ভোটে চার্চের ভূমিকা বরাবরই থাকত। উত্তর পূর্বাঞ্চলে তো চার্চের সমর্থন না পেলে কোনও দল সরকার গঠন করতে পারে না। এখন খাস পশ্চিমবঙ্গের উত্তরপ্রান্তের লোকসভা আসনগুলিতে চার্চের রাজনৈতিক খবরদারি হিন্দুদের চিন্তায় ফেলেছে। বিশেষ করে দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, রায়গঞ্জ এবং বালুরঘাটের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে চার্চের রমরমা চোখে পড়ার মতো। পাহাড়, তরাই এবং ডুয়ার্সের বেশ কিছু চা-বাগানে চার্চের কথামতোই যে ভোট হবে তা ধরে নিয়েছেন লোকসভা ভোটের প্রার্থীরা। সেই কারণে প্রত্যেকেই বিভিন্ন চার্চের ক্যাডারদের সঙ্গে গোপনে বৈঠক করছেন। চার্চের কাজে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। এমনকী আশীর্বাদ পেতে ফাদারকে মোটা দক্ষিণা দিতেও ভুলছেন না। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেছেন, গত ১৫-২০ বছরে ডুয়ার্স ও তরাইয়ে অসংখ্য চার্চ গজিয়ে উঠছে। বন্ধ চা-বাগানের শ্রমিকদের আর্থিক অনটনের সুযোগ নিয়ে তাদের ধর্মান্তর করছে পাদ্রীরা। দেওয়া হচ্ছে আর্থিক সাহায্য। পাদ্রীরা আর্থিক সাহায্য এবং পড়াশোনার ব্যবস্থা করে তিরকি, মিঞ্জ, ওরাও, লাকড়া, রাভা, মুন্ডা, টিয়া প্রভৃতি আদিবাসীদের সহজেই ধর্মান্তরিত করছে। তারপর ফুলমণির নাম ফিল্লি, মধুর নাম মাইকেল রেখে দিচ্ছে চার্চ। এছারাও সরাসরি চার্চ আসরে না নামলেও বহু বাগানে এন জি ও'র নামে ময়দানে নেমেছে মিশনারিরা। আলিপুরদুয়ার কেন্দ্রের বর্তমান এম পি জোয়াকিম বাকলা নিজেই খৃস্টান এবং এরকম এন জি ও চালান। তাঁকে আর এস পি এবার টিকিট দেয়নি। ফলে চার্চের গোঁসা হয়েছে। এখানকার খৃস্টানরা এক হয়ে যাতে বাকলাকেই ভোট দেয় তারও চেষ্টা শুরু হয়েছে।

শুধু দার্জিলিং নয়, আলিপুরদুয়ারেও জিততে পারে বি জে পি

গুঢ়পুরুষ ।। পশ্চিমবঙ্গের তিন দফা ভোটের প্রথম দফায় ১৪টি লোকসভার আসনের ভোট শেষ হয়েছে। এই প্রথম দফায় রাজ্যের সবচেয়ে বিতর্কিত ও গুরুত্বপূর্ণ দার্জিলিং আসনটি ছিল। এবার বিজেপি প্রার্থী যশবন্ত সিংহ কংগ্রেসের হাত থেকে দার্জিলিং আসনটি ছিনিয়ে নিচ্ছেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। দার্জিলিং ছাড়াও প্রথম দফার ভোটের পর আলিপুরদুয়ার ও বালুরঘাট আসন দুটিতেও বিজেপি প্রার্থীদের জয়ের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বিশেষত, আলিপুরদুয়ার সংরক্ষিত আসনে বিজেপি প্রার্থী মনোজ তিগ্গাকে এক জোট হয়ে ভোট দেওয়ার জন্য স্থানীয় নেপালী ভোটদাতাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার প্রধান বিমল গুরুং। তাছাড়া সেখানের ভূমিপুত্র রাজবংশী সম্প্রদায়ের ভোটাররাও আগাম জানিয়ে দিয়েছিলেন যে তাঁরা বিজেপি-কেই সমর্থন করবেন। এই আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্রে মোট

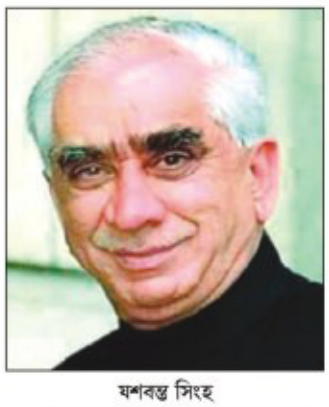
যশবন্ত সিংহ

সাতটি বিধানসভা আসন আছে। সাতটি বিধানসভার আসনের মধ্যে চারটি আসনেই জনজাতি সম্প্রদায়ের ভোটদাতাদের সমর্থনেই প্রার্থীদের ভাগ্য নির্ভর করে। এই ভোটদাতাদের প্রায় সকলেই স্থানীয় চা বাগানের শ্রমিক। এতকাল তাঁরা আর এস পি অনুগত ডুয়ার্স চা বাগান ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সমর্থক ছিলেন। এঁদের সমর্থনেই বিগত ৩০ বছর ধরে একটানা আর এস পি প্রার্থীরা সংসদে ও রাজ্য বিধানসভায় নির্বাচিত হয়ে চলেছেন। এবার তাঁরা বেঁকে বসেছেন। অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদ নামে সংগঠন গড়ে তাঁরা আগাম ঘোষণা করেছিলেন, বামফ্রন্টের আর এস পি প্রার্থী মনোহর তিরকিকে কখনই ভোট দেবেন না। বিকাশ পরিষদের নেতা জ্ঞান তিরকি স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলেন, "আমরা ১৯৭৭ সাল থেকে সংসদে এবং আলিপুরদুয়ার সংসদীয় কেন্দ্রের অন্তর্গত সাতটি বিধানসভার মধ্যে মাদারিহাট, আলিপুরদুয়ার, কালচিনি ও কুমারগ্রাম থেকে আর এস পি প্রার্থীদের এবং নাগরাকাটা, ফালাকাটা এবং তুফানগঞ্জ বিধানসভা আসনে সি পি এম প্রার্থীদের নির্বাচিত করেছি। কিন্তু গত ৩০-৩২ বছরে বাম প্রার্থীরা বন্ধ চা বাগানের নিরন্ন শ্রমিক

(এরপর ৪ পাতায়)

সন্ত্রাসবাদের নয়া সংযোজন

জম্মু-কাশ্মীরে মেয়ে জেহাদি পাঠাচ্ছে পাকিস্তান

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। জম্মু-কাশ্মীরে পাকিস্তানী সন্ত্রাসবাদীদের অনুপ্রবেশ করে ভিতরে ঢোকা, বিস্ফোরণ বা আক্রমণ কোনও নতুন ঘটনা নয়। তবে সেনাবাহিনী সূত্রে নিয়ন্ত্রণ রেখা (এল ও সি) থেকে যে সকল খবরা-খবর এসেছে তাতে একটু বিশেষ বদল বা ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে। যেমন, আগে ৩/৪ জন করে এক একটা ছোট ছোট দলে পাকিস্তানী জিহাদি জঙ্গিরা জম্মু-কাশ্মীরে ঢুকে পড়ত — ভারতীয় সীমা প্রহরীদের নজর এড়িয়ে। এখন কিন্তু দলে দলে ঢুকছে — এক এক দলে ৩০/৪০ জন সন্ত্রাসবাদী থাকছে। পরিস্থিতি অনেকটাই কারগিল যুদ্ধের ঠিক আগেকার মতোই দেখা যাচ্ছে। সেই সময়ে শীতে বরফ জমার সময়ে পাকিস্তানী জঙ্গিরা জম্মু-কাশ্মীরে এল ও সি (লাইন অফ কন্ট্রোল) বরাবর ভারতীয় কাশ্মীরে ঢুকে টিলা বা পর্বতশৃঙ্গের উপরে ঘাঁটি গেড়েছিল।

আগে বেশির ভাগ জঙ্গিরা আসত পাকিস্তানের পাঞ্জাব এবং পাক-অধিকৃত কাশ্মীর থেকে। এবার ভারতীয় রক্ষীদের কাছে ধৃতদের মাধ্যমে যে খবর এসেছে তাতে সেই অনুযায়ী বেশির ভাগ জঙ্গি এখন বালুচিস্তান এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে আসছে। তাছাড়াও তাদের হাতে রয়েছে আগের থেকে অনেক বেশি উন্নত ও অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র।

তবে এখন পাকিস্তান-প্রেরিত সন্ত্রাসবাদীদের দলে নতুন সংযোজন হল মেয়ে-আত্মঘাতী জঙ্গি। না, শুধু জঙ্গি নয়। এই প্রশিক্ষিত মহিলা আতঙ্কবাদীদের মধ্যে রয়েছে সম্পূর্ণ জম্মু-কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদ পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং পরিচালনা করতে সক্ষম মেয়ে জঙ্গি। একথা জানতে পারা গেছে জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের হাতে ধরা পড়া ২৫ বছর বয়সী সুন্দরী সন্ত্রাসী অসিয়া বেগমকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। অসিয়া বেগম ধরা পড়েছিল রাজৌরি জেলার সুন্দরবানীতে, সে গতবছর নভেম্বর মাসে ভারতে ঢুকে পড়েছিল। তাকে জিজ্ঞাসাবাদে জানা গিয়েছে, লাইন অফ কন্ট্রোলের ওপারেই ভারতে ঢোকার অপেক্ষায় রয়েছে

পুলিশী হেফজতে ধৃত অসিয়া বেগম (ডান দিকে)।

অসিয়া বেগম ধরা পড়েছিল রাজৌরি জেলার সুন্দরবানীতে, সে গতবছর নভেম্বর মাসে ভারতে ঢুকে পড়েছিল। তাকে জিজ্ঞাসাবাদে জানা গিয়েছে, লাইন অফ কন্ট্রোলের ওপারেই ভারতে ঢোকার অপেক্ষায় রয়েছে আরও সাতশত সুশিক্ষিত মহিলা জঙ্গি।

আরও সাতশত সুশিক্ষিত মহিলা জঙ্গি। সেনাপ্রধান দীপক কাপুর অফিসিয়ালি জানিয়েছেন, 'এল ও সি'র ওপারেই মহিলা জঙ্গিদের রীতিমতো প্রশিক্ষণ চলছে। তারা নির্বাচনের মুখে জনসভাতে আঘাত হানতে পারে। টার্গেট করতে পারে রাজনৈতিক নেতাদেরকে। মহিলা জঙ্গিদের একটা বিশেষ সুবিধা রয়েছে — পুরুষ সেনাকর্মীরা কাশ্মীরের মতো স্পর্শকাতর এলাকায় মেয়েদেরকে কাউন্টার করতে পারবে না।'

আপাতত জম্মু জেলে বন্দী অসিয়া আরও জানিয়েছে যে, আই এস আই-এর তত্ত্বাবধানে এল ও সি-র ওপারে ভিমবার কোতিল এবং সিনসাতে প্রশিক্ষণ শিবির রমরমিয়ে চলছে। তাদেরকে প্রশিক্ষণে এল ও সি-র কাঁটাতারের বেড়ার ভিডিও ফুটেজ দেখানো হচ্ছে। শেখানো হচ্ছে কোন্‌খান দিয়ে নজর এড়িয়ে বেড়া কেটে ঢুকে পড়তে হবে। ইতিমধ্যেই ভালো সংখ্যায় মহিলা জঙ্গিরা ভারতের ভিতরেও সক্রিয়।

এদিকে ভারতীয় জওয়ানরা বরফ গলা সত্ত্বেও উপত্যকার উঁচু জায়গা থেকে নেমে আসেনি। ফলে অনুপ্রবেশরত জঙ্গিদের সঙ্গে কুপওয়ারা সেক্টরের হাপুরদার জঙ্গলে তীব্র মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। গত ২০ মার্চ শুরু হওয়া সঙ্ঘর্ষ এক সপ্তাহ যাবৎ চলেছিল। ওই ঘটনায় ১৭ জন লস্কর এ তৈবা-র জঙ্গি নিহত হয়েছিল। আর ভারতের একজন মেজর সহ আটজন প্যারাকমাণ্ডো মারা পড়েছিল। ওখানে জঙ্গিদের কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছে — জি পি এস ডিভাইস, উত্তুঙ্গ উপত্যকার জঙ্গলের বিস্তৃত মানচিত্র, স্যাটেলাইট ফোন, বরফে ব্যবহৃত জুতো, বহুস্তরের জলভেদ্যটুপী সহ পোশাক, বরফ কাটার যন্ত্র, উন্নত শ্রেণীর শীত পোশাক প্রভৃতি। এসব রাজধানীর সাউথ ব্লকে যথেষ্ট চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। তবে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত মোকাবিলার আশ্বাস দিয়েছে। জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভার ভোটে উপত্যকার মানুষ ভোট দিতে যেভাবে উৎসাহ দেখিয়েছেন, তা পাকিস্তান ও পাক-প্রেরিত

(এরপর ৪ পাতায়)

নির্বাচন ঃ অসম

ইমামকে দিয়ে কংগ্রেসী প্রচার

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। ভোটের বাক্স থেকে পিছলে যাওয়া মুসলমান ভোট আটকাতে, অসমে কংগ্রেস জামা মসজিদের ইমাম মৌলানা সৈয়দ ইয়াহিয়া বুখারিকে ময়দানে নামিয়েছে। এই লেখা যখন বের হবে তখন অসমে নির্বাচন পর্ব শেষ। কিন্তু কংগ্রেসের

তরুণ গগৈ

ইমাম ইয়াহিয়া

তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার আড়ালে সত্যিকার স্বরূপটা কি তা এতে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। অসমে বিগত কয়েকবছর থেকে মুসলমান ভোটব্যাঙ্ক কেন্দ্রিক রাজনীতিতে মৌলানা বদরুদ্দিন আজমলের নেতৃত্বে 'অসম ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টে'র উত্থান কংগ্রেসের চিরাচরিত মুসলিম ভোটব্যাঙ্কে ভাঙন ধরিয়েছে। ২০০৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে তার ফলও ফলেছিল ভালোই। শেষ পর্যন্ত বোড়ো জনজাতিদের আঞ্চলিক দলের সঙ্গে সমঝোতা করেই কংগ্রেসকে মন্ত্রিসভা গঠন করতে হয়। সেজন্যই রাজ্য কংগ্রেস জামা মসজিদ সংযুক্ত ফোরামের সভাপতি মৌলানা সৈয়দ ইয়াহিয়া বুখারিকে দিয়ে মুসলমানদেরকে কংগ্রেসকে ভোট দেওয়ানোর অনুরোধ করাচ্ছে। গত ২১ এপ্রিল গুয়াহাটিতে বুখারি নিজেই বলেছেন, এ ইউ ডি এফ মুসলমান ভোট ভাগ করছে। আমি এখানে এসেছি মুসলমান ভোট যাতে কংগ্রেসই পায় তা নিশ্চিত করতে। অসমে দু'দফায় ভোটের

(এরপর ৪ পাতায়)

আয়ের সুবর্ণ সুযোগ!!!
SBI Life Insurance প্রমোট করছে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্ক State Bank of India, SBI Life সীমিত সংখ্যক Insurance Advisor নিয়োগ করছে।
যে কোনও পুরুষ / মহিলা HS পাশ / পিয়ারলেস, GTFS, Alchemist Rose Valley ও সাহারা Agent / VRS নেওয়া Govt. Employee / Postal Agent / অবসরপ্রাপ্ত Bank Employee-রা আবেদন করতে পারেন।
যারা সফল কেরিয়ার করতে ইচ্ছুক তারা Interview-র জন্য যোগাযোগ করুন –
Mr. Ajoy Kumar Saha Mobile : 9830952221
SBI Life
INSURANCE
With Us, Your's Sure

বসু গবেষণা কেন্দ্র দুষ্কৃতীদের মুক্তাঞ্চল

বিশ্বজিৎ নাথ, উত্তর ২৪ পরগণা।। আজও বিস্মৃতির অতলে উত্তর ২৪ পরগণার শ্যামনগর সাহেববাগানের ঐতিহ্যবাহী বসু গবেষণা কেন্দ্র। প্রায় ৫০ বিঘা জমির ওপর ওই গবেষণা কেন্দ্রটি। এটি প্রধানত কৃষি গবেষণা কেন্দ্র নামে পরিচিত। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে আজ নিশ্চিহ্নের পথে এই কেন্দ্র। পুরসভা ও স্থানীয় প্রশাসনকে বহুবার জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি।

আজ থেকে বহু বছর আগে, বিজ্ঞানসাধক আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণার জন্য শ্যামনগর সাহেববাগানে গবেষণা কেন্দ্রটি স্থাপন করেছিলেন। জানা গেছে, ব্যক্তিগতভাবে তিনি ১৩ লাখ টাকা দিয়ে কলকাতা, কালিম্পং ও শ্যামনগরে গবেষণা কেন্দ্র গড়েছিলেন। কিন্তু দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধ রয়েছে এই গবেষণাগার। গবেষণাগারের জমি, বাড়ি, পুকুর, এমনকি মাঠের নিরাপত্তা বলয় বলতে কিছুই নেই। স্থানীয় মানুষজন নিজেদের সম্পত্তি ভেবে ব্যবহার করছেন এসব। চারপাশের কাঁটাজাল নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। চারজন কেয়ারটেকার ও দু'জন চাষী সামান্য বেতনে ভবিষ্যতের লক্ষ্যে বেগার খেটে চলেছেন। স্থানীয় মানুষজনের অভিযোগ, দিনের বেলায় এখানে চলছে মদ-সাট্টা আর জুয়ার আসর। আর রাতে নানা অসামাজিক কাণ্ডকারখানা। প্রাণভয়ে প্রতিবাদ করার সাহস পান না তাঁরা। প্রহরীদের অভিযোগ, তাঁদের নেই কোনও পোশাক, বাঁশি, এমনকী আত্মরক্ষার লাঠিও। দুবার দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত হয়েছেন দু'জন প্রহরী। কলকাতার এ পি সি রোডের প্রধান কার্যালয়ে বহুবার জানানো হয়েছে। শুধুই মিলেছে শুষ্ক আশ্বাস। এমনকী মাত্র ৭০০ টাকা মাসিক বেতনে দিনের পর দিন কাজ করতে হচ্ছে। অপরদিকে বাগানের চাষী নিতাই মণ্ডল জানান, আগে বিভিন্ন ধরনের শাক-সব্জী থেকে শুরু করে ধান চাষ হত। এছাড়া কয়েক বিঘা জমির ওপর একটা ফুলের বাগানও ছিল। প্রায় ১০০ জন কর্মী ছিল। বহু ধরনের ধান গবেষণা করা হত এখানে। দুষ্কৃতীরা গবেষণাগারের সমস্ত সরঞ্জাম নিয়ে চম্পট দিয়েছে। এখানকার বহু কর্মীকে ফলতা ও মধ্যমগ্রামে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। কর্মীদের নেই কোনও পরিচয়পত্র। এক কথায়, অবহেলার অন্ধকারে অব্যক্তের রচয়িতা বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসুর গবেষণা কেন্দ্র। স্টাফ কোয়ার্টারগুলি ভগ্নদশায় পরিণত। মাঠে অবাধে গরু-মোষ চরে বেড়াচ্ছে। স্থানীয় বিধায়ক হরিপদ বিশ্বাস জানিয়েছেন, জমিটি নিয়ে সমস্যা রয়েছে। তাছাড়া বেসরকারি সংস্থা তাদের যদি সদিচ্ছা না থাকে, তাহলে কারও কিছু করার নেই। তবে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, কর্তৃপক্ষ ও রাজ্য সরকারের সঙ্গে কথা বলে ফের পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা চেষ্টা করা হবে। কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায়, আদৌ কী পুনরুজ্জীবন ঘটবে বসু গবেষণা কেন্দ্রের? এভাবেই দিনের পর দিন চলতে থাকলে কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে শ্যামনগরের ঐতিহ্যবাহী বসু গবেষণা কেন্দ্রটি।

উদ্বেগে মায়াবতী

নিজস্ব প্রতিনিধি।। লোকসভা নির্বাচন প্রায় শেষের মুখে। দেশ শাসনের রশি কার হাতে থাকবে তা নিয়ে চলছে চুলচেরা বিচার। তবে অনেকটাই নির্ভর করে বিশেষত উত্তরপ্রদেশের ওপর। কেননা, এরাজ্যে লোকসভার আসন ৮০টি। তাই ফলাফল নিয়ে এরাজ্যের নেতারা খুব উদ্বিগ্ন। এখন থেকেই তারা ভালো-মন্দ— দুই অবস্থারই কীভাবে মোকাবিলা করা যায়, তার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মায়াবতী জানেন, এই নির্বাচন তাঁর কাছে একটা চ্যালেঞ্জ। তাঁর প্রধানমন্ত্রী হওয়া না হওয়া নির্ভর করবে এবারের জনাদেশের ওপর। আর এই লক্ষ্য পূরণের জন্য এযাবৎ তিনি একাকী আলাদা পথেই হেঁটেছেন। তৈরি করেছেন বহু রাজনৈতিক শত্রু। তিনি জানেন, যদি উত্তরপ্রদেশে কমপক্ষে ৪০টি আসনে জয়লাভ করতে পারেন, তাহলে নিজের প্রধানমন্ত্রী হওয়া যদি সম্ভব নাও হয়, তবে কে প্রধানমন্ত্রী হবেন সেটা তিনিই স্থির করে দেবেন। শুধু তাই নয়, তিনি তৃতীয় ফ্রন্টেরও সর্বজনগ্রাহ্য নেতা হিসাবে উঠে আসবেন। আর যদি ব্যর্থ হন, স্বাভাবিক ভাবেই তৃতীয় ফ্রন্টের শরিকরা তাঁকে পাত্তা দেবেন না। এমনকী তিনি উত্তরপ্রদেশে রাজ্যপাট চালাতেও অসুবিধায় পড়বেন। কেননা, কংগ্রেস, বি এস পি এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতারা তাঁর প্রতি এতটাই ক্ষুব্ধ যে তা সহজে মেটার নয়। তাঁর দলের বিখ্যাত সামাজিক একীকরণের ধারণাও অনেকটা ঘা খাবে।

এই সময়

অমার্জিত ভাষা

রাজনীতির মাঠে কি বক্তাদের ভাষা পথ হারায়! শব্দের ঈঙ্গিতে এমনই আভাষ দিলেন খোদ সোনিয়া গান্ধী। এন ডি এ-এর প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী লালকৃষ্ণ আদবানীকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করতে গিয়ে, সঙ্ঘ সম্বন্ধে কটুকথা শোনালেন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী। সম্প্রতি দিল্লী থেকে প্রকাশিত হিন্দি সাপ্তাহিক 'পাঞ্চ জন্য' পত্রিকা এই ঘটনায় সোনিয়ার কঠোর সমালোচনা করেছে। আদবানীকে আর এস এস-এর গোলাম বলায়, সঙ্ঘ এবং পাঞ্চ জন্য-র পক্ষ থেকে সোনিয়ার নিন্দা করা হয়েছে। সোনিয়া গান্ধীর মতো নেত্রীর এই ধরনের শব্দ ব্যবহারকে ভালো চোখে নিচ্ছেন না সাধারণ মানুষও। অনেকের মতে, সঙ্ঘ কোনওদিনই রাজনীতির মাঠে নামে না। সুতরাং সঙ্ঘকে টেনে আনা তাঁর ঠিক হয়নি। পাঞ্চ জন্য-র সম্পাদকীয়তেও এর নিন্দা করা হয়েছে।

নির্বাচনী প্রচার

নির্বাচন বড়ই বিষম বস্তু। ভোটের লড়াইয়ে জিততে অনেক কিছুই করতে হচ্ছে নেতাদের। সারাদিন প্রচার, ফোনা-ফোনি আরও কত কী! সারাদিন সাইকেল চালিয়ে, নিজের প্রচার নিজেই করলেন এমনই এক নির্দল প্রার্থী শ্যামলাল গান্ধী। পাঞ্জাবের অমৃতসরের তিনি নির্দল প্রার্থী। গত ২৬ মার্চ রবিবারের ছুটির দিন নিরাপত্তারক্ষীকে সাইকেলের পিছনের কেরিয়ারে বসিয়ে নিজেই নিজের ঢাক পেটালেন। শুভ্র বসনে কখনও হাইওয়ে, কখনও গলিপথে দিব্যি প্রচার চালালেন। লক্ষ্য যেন তেন প্রকারেণ ভোট বৈতরণী পার হওয়া।

জনপ্রিয়তায় 'মিশেল'

স্বামী না স্ত্রী — কার পরিচয় বড়? এই প্রশ্নই হয় তো খুব শীঘ্র বিশ্ব জুড়ে আলোচ্য হয়ে উঠতে পারে। সম্প্রতি সমীক্ষায় প্রকাশ, বিশ্ববাসীর কাছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার থেকেও তাঁর স্ত্রীর পরিচিতি সব থেকে বেশি। স্ত্রী মিশেল ওবামার খ্যাতিও তার চাইতে বহুগুণ বেড়েছে। 'ইউ এস এ টুডে'-র সমীক্ষায় দেখা গেছে, ৭৯ শতাংশ মানুষ ওবামার স্ত্রীকেই বেশি জনপ্রিয়-র তালিকায় স্থান দিয়েছে। বারাক ওবামার এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য না জানা গেলেও, খবরের শিরোনামে থাকা ওবামা-পত্নী এতে রীতিমতো খুশী।

গোপনে স্বীকার

এ রাজ্যে উন্নয়ণের কাজে বরাদ্দ কেন্দ্রের টাকা ফেরৎ যাওয়ার ইতিহাস নতুন নয়। এন ডি এ-র আমলেও বামফ্রন্ট সরকার কেন্দ্রের টাকা কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছে, ফেরৎ চলে গিয়েছে কোটি কোটি টাকা। এবার সিপিএমের পলিটব্যুরো সদস্য সীতারাম ইয়েচুরিও পরোক্ষে স্বীকার করলেন এই ব্যর্থতা। ২৫ এপ্রিল এক মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে ইয়েচুরি বলেন, 'পদ্ধতিগত অসুবিধার কারণে উন্নয়ণের ক্ষেত্রে বরাদ্দ টাকা খরচ করতে পারেনি বামফ্রন্ট সরকার'। বামফ্রন্ট সরকারের এই ব্যর্থতার চিত্র ইতিমধ্যেই বিভিন্ন সরকারি সমীক্ষার রিপোর্টে ধরা পড়েছে। তবে এদিন ইয়েচুরি বামরাজত্বের মিথ্যা উন্নয়ণের বুলি আওড়াতে ভোলেননি। ইয়েচুরির পরোক্ষ স্বীকারোক্তি অবশ্য প্রকাশ্যে বামরাজত্বের পর্দা ফাঁস করে দিয়েছে।

এক নম্বরে

তিনি সিদ্ধি দাতা, বিনায়ক। ভগবান গণেশের এই রূপ শুধুমাত্র ভারতবাসীর জন্য নয়। সমগ্র বিশ্বের কাছেও তিনি সিদ্ধি দাতা। ইদানীং আমেরিকা সহ বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মান, নেদারল্যাণ্ড, নিউজিল্যান্ড, চীনে-র মতো দেশে গণেশের মূর্তির চাহিদা বাড়ছে। বিভিন্ন সংগ্রহশালা-গুলিতেও গণেশের মূর্তি প্রথম সারিতে রাখা হচ্ছে। সংবাদসূত্র অনুসারে পাওয়া খবর অনুযায়ী, ছোটো বড় সব শ্রেণীর মধ্যেই গণেশের চাহিদা এখন তুঙ্গে। গণেশের সব ধরনের মূর্তিরই চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে বলেও জানা গেছে।

উল্টোচিত্র

একদিকে পাক গোয়েন্দা সংস্থা আই এস আই-কে শুদ্ধি করণের কথা ঘোষণা করছেন পাক-বিদেশমন্ত্রী শাহ মাহমুদ কুরেশি। অন্যদিকে সোয়াত সহ অন্যান্য অঞ্চ লগুলিতে কঠোরভাবে তালিবানী রীতি প্রচলনের জন্য ফতোয়া জারি করেছেন তালিবান কমান্ডার মৌলবী ফকির আহমেদ। এমনকী তাদের এই নীতি অন্যান্য প্রদেশগুলিতেও কেন চালু করছে না সরকার, সে ব্যাপারেও পাকিস্তানের সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করছেন ফকির আহমেদ। রাষ্ট্রসঙ্ঘের তথ্য অনুযায়ী, পাক সরকার যদি আন্তরিকভাবে পাকিস্তানকে উগ্র শরিয়তি আইন থেকে মুক্ত করার চেষ্টা না করেন তাহলে, সোয়াত উপত্যকার মতো পুরো পাকিস্তানই তালিবানদের কবলে চলে যাবে।

প্রধানমন্ত্রীর প্রলাপ

সজ্জন হিসাবে তাঁকে এক শ্রেণীর প্রচার মাধ্যম তুলে ধরার চেষ্টা করলেও, তাঁর মন্তব্য ঘিরে শুরু হয়েছে নানা প্রশ্ন। তাঁর মন্তব্য আসলে কি প্রলাপ? অপলাপ নাকি তা বিলাপ! গত ২৬ এপ্রিল গুজরাটে বক্তব্য রাখতে এসে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং বলেন, গুজরাটে নাকি বিজেপি বা নরেন্দ্র মোদীর আমলে উন্নত হয়নি। উন্নতি হয়েছে ওদের আসার আগেই, ওরা শুধু শুধু প্রশংসা নিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্যে পুলিশ অফিসার আমলারা তো বিস্মিত হন-ই — সাধারণ মানুষকেও বলতে শোনা যায়, রাজীব গান্ধী ফাউন্ডেশন মোদী ও গুজরাটকে উন্নয়ণের অগ্রদূত বলে ঘোষণা করা সত্ত্বেও, প্রধানমন্ত্রী কেন এমন মন্তব্য করলেন তা নিয়ে তারা বিস্মিত। প্রসঙ্গত, এর আগে প্রধানমন্ত্রী বামপন্থীদের দেশপ্রেমী ও ভালমানুষ বলে সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

বিদায়ী মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের উদ্বেগ

সম্প্রতি দিল্লীতে বিদায়ী মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার এন গোপালস্বামী আমাদের দেশে ক্রমবর্ধমান রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ণ লইয়া গভীর অনুতাপ প্রকাশ করিয়াছেন এবং যাহাদের বিরুদ্ধে জঘন্য ফৌজদারি মামলা রহিয়াছে তাহারা যাহাতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে না পারেন এজন্য কঠোর আইন প্রণয়ণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁহার উদ্বেগ সঠিক এবং ভারতীয় রাজনীতিকে যাহা সঙ্কীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে, সেই পচনের মূলকে উৎপাটিত করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে — এই প্রস্তাব যথার্থ। ইহা শুধু রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন নহে, অপরাধের রাজনীতিকরণ আর ইহাই আমাদের দেশকে সামান্য হইলেও বিশ্বের অন্যতম দুর্নীতিপরায়ণ দেশ হিসাবে চিহ্নিত করিয়াছে। গণতান্ত্রিক এবং সংবিধানিক রীতিনীতির প্রতি ভারতবাসীর বিশেষত রাজনীতিজীবীদের কোনও শ্রদ্ধা নাই। ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলিয়া যদি আমরা গর্ব অনুভব করি, তাহার একমাত্র কারণ আমরা বিশ্বের দ্বিতীয় জনবহুল দেশ। (আমাদের অনিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যাবৃদ্ধি এবং বাস্তবমুখী জনসংখ্যা নীতির কঠোরভাবে প্রয়োগ করিবার ক্ষেত্রে সরকারি ব্যর্থতার জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ)। এবং দ্বিতীয়ত, বিশ্বের সর্বাধিক জনবহুল দেশ চীন যেহেতু কমিউনিস্ট রাষ্ট্র তাই আমরা যে বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলিয়া গর্ববোধ করি, বস্তুত তাহার মধ্যে আদৌ কোনও গর্বের ব্যাপার নাই। বিশেষত আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক কাজকর্ম যেভাবে পরিচালিত হয় সেই দৃষ্টিতে যদি দেখা যায়, তাহা হইলে ইহা আরও স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হইবে। আমাদের আইনসভাগুলি এখন এমনসব আইন প্রণেতাদের ভীড়ে ভর্ত্তি যাহারা নিজেরাই এক একজন আইন ভঙ্গকারী। এমনকী তাহাদের বিরুদ্ধে অপরাধের চার্জসীটও রহিয়াছে। গত লোকসভায় ১২০ জনেরও বেশি এমন সাংসদ ছিলেন যাহাদের বিরুদ্ধে অপহরণ, দাঙ্গা, ধর্ষণ, লুট, খুন — প্রায় সবরকম অপরাধের অভিযোগ ছিল। এখন এমন কী গ্যারান্টি রহিয়াছে যে পঞ্চ দশ লোকসভাকে এইসব দাগীদের হইতে মুক্ত রাখা যাইবে? নিজেদের পেশীবলে কিংবা অসহায় ও আত্মরক্ষায় অসমর্থ মানুষকে ভয় দেখাইয়া যাহারা একবার সাংসদ হিসাবে নির্বাচিত হইয়াছেন, সেই সুবাদে তাহারাই এখন দায়মুক্ত নিরাপদ জীবনযাপনের সুখ অনুভব করিবেন। আর এখানেই গোপালস্বামী আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে লাগামছাড়া অপরাধীদের এই সংখ্যাধিক্য যেন বর্তমান রাজনীতিতে গুণ্ডাদের অপরিহার্য বলিয়া মনে হইতেছে।

প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার আরও একটি বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। এই দেশের নির্বাচনী প্রক্রিয়ার আরও একটি বড় সমস্যার মুখোমুখি হইল টাকার খেলা। তাঁহার বক্তব্য — 'আমি এইরকম বলিতেছি না যে ধনীরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন না। যে পরিমাণ টাকা ব্যয় করা হইতেছে তাহা বিশাল অঙ্কের। যে সমস্ত দল বলিতেছে ২৫ লক্ষ টাকার সর্বোচ্চ সীমা নিতান্তই কম, আমি তাহাদের বলিতে চাই যে এমন অনেক পার্টি রহিয়াছে যাহারা ওই পরিমাণ টাকাতেই কাজ চালাইয়া থাকে। তাহা হইলে অন্যদের ক্ষেত্রে তাহা হইবে না কেন?' উত্তরটা অবশ্য খুবই সহজ, তুমি যতো টাকা খরচ করিবে (যাহারা অর্থ আরও টাকা বিতরণ করিয়া তুমি ভোটারদের কিনিবে) এবং অর্থ প্রাপ্তির বিষয়ে তুমি যতো নিশ্চিত হইবে (যাহার অর্থ অর্থপ্রাপ্তির বিভিন্ন উৎসগুলি তোমার জানা, অধিকাংশই যা কালো টাকা), আদৌ কোনও কিছুই না করিয়াও ভোটে জয়লাভ করিবার সম্ভাবনা তত বেশি উজ্জ্বল হইবে। ভারতীয় রাজনীতিতে টাকার ক্ষমতা একটা বাস্তব সত্য, ভোটাররা এখানে ক্রয়যোগ্য। কেননা ভারতের অধিকাংশ ভোটার, যাহাদের বেশীর ভাগই গ্রামীণ, তাহারা দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও অবহেলার শিকার। পেশীবলের মতো অর্থবলও ভোটযুদ্ধে এখন একটা বড় শক্তি। কারণ কোনও কিছু না করিয়া গুণ্ডাগিরি ও ভোটারদের ভীতি প্রদর্শন ভোটে জিতিবার একটি ফাঁদ। এখন রাজনীতি হচ্ছে কিছু করে কম্মে খাওয়ার রাস্তা। এই পথে এসে 'আঙুল ফুলে কলাগাছ' হওয়ার দৃষ্টান্ত অনেক। অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যসভার সাংসদ টি সুববারামি রেড্ডি র সম্পত্তির পরিমাণ ২৩৯.৬ কোটি। সামান্য একজন রাজমিস্ত্রির কন্ট্রাক্টর থেকে আজ তিনি দেশের বড় একজন কন্ট্রাক্টর। এমন সুববারামি ভারতের রাজনীতিতে অনেক রয়েছে। আমজনতার প্রতিনিধি হিসাবে যারা ক্ষমতা পেয়েছেন, এখন তাদের সম্পত্তির পরিমাণ একজন আমজনতার সারা জীবনের উপার্জনের থেকে পাঁচগুণ বেশি। যাহাই বলা হউক না কেন, অর্থ ও পেশী নির্বাচনী যুদ্ধে একটা বড় অস্ত্র এবং যে কোনও মূল্যেই হউক এই দুই অস্ত্রের প্রভাব এখনও অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রয়াস প্রবল। তাহা হইলে ভারতীয় গণতন্ত্রে ইহাদের অপেক্ষা আর কী ভালো প্রতিনিধি আশা করা যায়? এন গোপালস্বামীর মতো মানুষেরা ইহার উত্তর জানেন। এই অঞ্চলে যেখানে পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও নেপালের মতো প্রতিবেশী দেশগুলি গণতন্ত্রের ধারণাটিকে এখনও আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে চায়, সেখানে এই অনুতাপ ছাড়া আর কী করিবার আছে?

বরুণ গান্ধী এবং নগ্ন রাজনৈতিক অভিসন্ধি

দেবীপ্রসাদ রায়

বরুণ গান্ধীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং এমন ধারায় যাতে সে জামিন না পায়। ফলত বরুণ গান্ধীকে প্রথমে পিলভিট জেলে রাখা হয়েছিল এবং পরে তাকে এটাওয়া জেলে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। (এখন প্যারলে মুক্ত) উত্তর প্রদেশের এই পিলভিট লোকসভা কেন্দ্র থেকেই বি জে পি-র হয়ে প্রার্থী হয়েছে বরুণ। কংগ্রেস, সি পি আই (এম) সহ বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দলের আচার-আচরণ এবং নির্বাচন কমিশনের অত্যুৎসাহী ভূমিকা যাতে ভারতীয় জনতা পার্টি তাকে মনোনয়ন না দেয় — এসব দেখে মনে হচ্ছে যেন বরুণ এক সাংঘাতিক ভাবে বিপজ্জনক ক্রিমিন্যাল — যার রেকর্ড লোকসভা এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা অলঙ্কৃত করে থাকা দাগী আসামীদের রেকর্ডও ছাপিয়ে গেছে, যেন বরুণের এমন দীর্ঘকালীন ভয়প্রদ পশ্চাৎপট আজ যার জন্য জনসমাজে ঘোরাফেরা করা বিপজ্জনক। এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তো সংবিধানের প্রতি দায়বদ্ধতার কারণে সংবিধানসম্মতভাবে বরুণকে রোলারের তলায় পিষে মেরে ফেলার কর্তব্য পালনের মহৎ ইচ্ছা প্রকাশ করে ফেলেছেন। কিন্তু সাধারণ দেশবাসী তা মনে করে না, মনে করে এক হীন চক্রান্তই লঘু পাপে গুরুদন্ড দিয়ে বরুণকে খতম করতে চাইছে। দেশবাসী মনে করে কৃত্রিমভাবে আলোকিত এক গান্ধীর উত্থানের পথকে নিষ্কন্টক করতে আর এক স্বপ্রভ গান্ধীর উত্থানকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করতেই এই সম্মিলিত উদ্যোগ।

এসব দেখে দেশবাসী ক্ষুব্ধ, দেশবাসী ব্যথিত ও স্তম্ভিত।

বরুণ গান্ধী দেশব্যাপী উত্তেজক বক্তৃতা দিয়ে ঘুরে বেড়ানো কোনও প্রতিষ্ঠিত জননেতা নয়। কোনও জনসভায় তার প্রথম রাজনৈতিক আত্মপ্রকাশ যদি উত্তেজক কোনও ভাষণ হয়েও থাকে, যদি সে ভাষণ সংবিধান বিরোধীও হয়, তাকে থানায় ডেকে সতর্ক করে দেওয়া যেত — তা না করে তড়িঘড়ি সত্যি-মিথ্যে নানা অভিযোগ তৈরি করে যেভাবে জেলে পোরা হল, তা নিয়ে ভাবনা-চিন্তার যথেষ্ট অবকাশ আছে।

বরুণের ভাষণ কতটা সাম্প্রদায়িক, কতটা সংবিধান বিরোধী তার বিচার হয়েছে? বরুণের তুলনায় কাজে, কর্মে, ভাষণে আরও বেশি সাম্প্রদায়িকতা যেখানে প্রকাশ পেয়েছে, সেখানে ব্যবস্থা নেওয়া হয়? ভারতের ইসলামিকরণে নিয়োজিত ধর্মান্ধ জঙ্গিদের সাথে সংযোগ রক্ষাকারী মাদানী কী করে নিশ্চিন্ত চিত্ত হয়? জনজীবন রক্তাক্তকরণের প্ররোচনা ধর্মীয় কারণে হলে অপরাধ, আর রাজনৈতিক হলে অনুমোদনযোগ্য, সংবিধানসম্মত? বরুণকে পিষে মেরে ফেলার ঘোষক মন্ত্রী অথবা ছত্রধর মাহাতোকে আছড়ে মেরে ফেলার হুমকি দাতারা নিশ্চিন্ত থাকবেন, নিশ্চিন্ত থাকবেন জনসভায় 'নন্দীগ্রামের মানুষদের জীবন হেল্ করে দেওয়ার ঘোষক যে, তারা? সংসদের সদস্য দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করবেন, তিনি আগে 'মুসলিম পরে ভারতীয়' — সেকুলার রাষ্ট্রে এই উক্তি সংবিধানসম্মত, এখানে চোখবুজে থাকা যায়, বরুণ গান্ধীর বেলায় অন্যরকম? দক্ষিণী এক নেতা অতিসম্প্রতি বলেছেন, এল টি টি ই-র সাথে শ্রীলংকায় যুদ্ধ বিরতি চুক্তি না হলে রক্তগঙ্গা বইবে, রাজীব গান্ধীর পরিণতি প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। সেকুলার সরকার চুপচাপ কেন? বরুণ গান্ধীকে বেছে নিয়ে তাকেই খতম করতে হবে?

বরুণ গান্ধীর ভাষণ স্বাধীনতার ২৬ বছর পরে সংবিধান সংশোধনের দ্বারা প্রবিষ্ট 'সেকুলার' শব্দটির নাকি বিরোধী।

জানতে ইচ্ছে করে এই 'সেকুলার' শব্দটির সংজ্ঞা স্পষ্ট ভাবে জানা আছে কারো? সংবিধান বিশেষজ্ঞরা অথবা রাজনৈতিক নেতারা জানেন? প্রকৃত অর্থে যদৃচ্ছ ব্যবহারে 'সেকুলার' শব্দটি রাজনীতি করা লোকেদের জন্য ব্যভিচারের কেন্দ্র হয়ে গেছে। এই শব্দটির প্রকৃত অর্থের সন্ধান করা যাক।

> **১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর যে সংবিধান গ্রহণ করছি বলে বলা হয়েছে তাতে কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ শব্দগুলি আদৌ ছিল না। ছাব্বিশবছর পরে সংবিধানের ৪২ তম সংশোধনীর মাধ্যমে ওই শব্দদুটি ঢোকানো হয়েছে, তাহলে ১৯৪৯ সালের ২৬ শে নভেম্বর যা প্রকৃতভাবে ছিল না তাকেই তুলে ধরা হচ্ছে না? এটা কী একধরনের জালিয়াতী নয়?**

সেকুলার শব্দটি ল্যাটিন ভাষার 'Sculum' শব্দ থেকে নেওয়া — অর্থ যা চার্চ সংক্রান্ত নয়, যাজকীয় নয়, Non religious, Non eclasiastical Profane অপবিত্র — যা ঈশ্বর বিরোধিতা বা ঈশ্বর নিরপেক্ষতায় উত্তীর্ণ হয়ে ইউরোপে দীর্ঘ সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনের শেষে একটি রেনেশাঁধর্মী মহিমা লাভ করে, ভাষ্য নির্মাণে যা ধর্মবিরোধী বা ধর্মনিরপেক্ষতার পর্যবেশিত হয়। মানব প্রজাতির উপর ধর্ম ও ঈশ্বরের প্রভাবের কথা সম্ভবত জন লক, ভলটেয়ার,মন্টেস্কী, ডি এলামবার্ট, রুশো প্রমুখরা 'সেকুলারিজম্' শব্দটিতে শেষমেশ পরধর্ম সহিষ্ণুতার মাত্রা যুক্ত করে। স্বয়ং লেনিন মার্ক্সীয় আদর্শ গ্রহণ ও রূপায়ণের দায়িত্ব নিয়েও বাস্তবতার বিচার 'সেকুলার' বা ধর্মহীনতার প্রবক্তা হননি। তাঁর ১৯০৫ সালে রাশিয়ার জার-এর কাছে বিপ্লবীদের জন্য পেশ করা দাবীগুলির প্রসঙ্গে লিখেছিলেন ঃ "The state must not concern itself with religion, religious societies must not be connected with the state power. Every one should be absolutely free to profom whatever religion he prefers or recognise no religion ..... There must be do discrimination whatever in the rights of citizens on religious grounds no state grants must be made to ecclasiastic and religious societies which must become absolutely independent, Voluntary associations of like minded citizens,"

এবার লেনিন অনুগামী সেকুলাররা বলুন তারা অর্থাৎ প্রগতিশীল কমিউনিস্টরা এটা অনুসরণ করছেন? যারা 'সেকুলার' শব্দটি সংবিধানে প্রবিষ্ট করালেন তারা প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, সততা ও সমদর্শিতা বজায় রেখে চলেছেন? মুসলিম হজ যাত্রীদের জন্য অনুদান বৃদ্ধি হয় কী করে, আর কী করেই বা গঙ্গাসাগর তীর্থযাত্রীদের উপর কর বসে! কেন সুন্দরবনে 'বনবিবি' উৎসবে মন্ত্রীরা অংশগ্রহণ করেন, কেনই বা ধর্মের ভিত্তিতে 'জেলাগঠন' করা হয় সেকুলার সরকার থেকে? হিন্দুপুরাণখ্যাত রামসেতু (ত্বষ্টত্রষ্টর উপগ্রহ ছবিতে চিহ্নিত)-র ধ্বংসসাধন করা হবে হিন্দু মানসিকতা অগ্রাহ্য করে, অন্যদিকে জাতীয় নিরাপত্তাকে তুচ্ছ করে বিমান বন্দরে থাকা মসজিদ-কে বাঁচানো হবে? প্রধামন্ত্রী রামজন্মভূমিতে মন্দিরে শিলান্যাস করেন কী করে? সকল নাগরিকের জন্য জাতিধর্ম নির্বিশেষে এক আইন (Uniform Civil Code) চালু করতে সরকারের অনীহা কেন, সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও? এই রাষ্ট্র সেকুলার? এইসব ভন্ডামীর মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ কেন, ব্যক্তি বিশেষের উপর জোর-জবরদস্তি চলবে সংবিধানের দোহাই দিয়ে? ভন্ড সেকুলাররা সংবিধানকে নিয়ে কীভাবে খেলা করে যাচ্ছেন তার একটি উদাহরণ দিই।

পশ্চিমবঙ্গে সব স্কুল পাঠ্য বইতে সংবিধানের উদ্দেশিকা ছাপানো থাকে বিভিন্ন ভাষায়, যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা সংবিধান বর্ণিত সেকুলার এবং সোস্যালিষ্ট হয়ে ওঠে। উদ্দেশিকা (Preamble) রাখা হয়েছে এইভাবেঃ

"আমরা ভারতের জনগণ ভারতকে সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ (Secular?) গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্ররূপে গড়ে তুলতে এবং তার সকল নাগরিকেই যাতে সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায় বিচার, চিন্তা মত প্রকাশ বিশ্বাস ধর্ম এবং উপাসনার স্বাধীনতা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা এবং তাদের সকলের মধ্যে যাতে ভ্রাতৃত্বের ভাব গড়ে ওঠে তার জন্য সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করে আমাদের গণপরিষদে আজ ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর এতদ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ এবং নিজেদের অর্পণ করছি," কিন্তু শিক্ষার্থীদের পাঠ্য বিষয় দেবার শুরুতেই কী মিথ্যাচার ঘটছে একবার দেখুন। ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর যে সংবিধান গ্রহণ করছি বলে বলা হয়েছে তাতে কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ শব্দগুলি আদৌ ছিল না। ছাবিবশবছর পরে সংবিধানের ৪২ তম সংশোধনীর মাধ্যমে ওই শব্দদুটি ঢোকানো

(এরপর ৪ পাতায়)

আলিপুরদুয়ারেও জিততে পারে বিজেপি

(১ পাতার পর)

পরিবারের কল্যাণে কিছুই করেনি। আমরা এবার বাম প্রার্থীকে উপযুক্ত শিক্ষাই দেব"।

একদা লাল দুর্গ আলিপুরদুয়ার সংসদীয় কেন্দ্রে এবার লাল রং ফিকে হয়ে গেছে। গোর্খাল্যাণ্ডের দাবি নস্যাৎ করতে বামেরা বনবাসী চা শ্রমিক পরিবারের নিরন্ন মানুষজনকে নেপালিদের বিরুদ্ধে অস্ত্র করেছিল। সেই অস্ত্র এখন বুমেরাং হয়ে আঘাত হেনেছে অতি চালাক বামদের। গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো আর এস পি প্রার্থী মনোহর তিরকিকে হারাতে আদাজল খেয়ে পিছনে লেগেছিলেন ওই দলেরই চারবার নির্বাচিত সাংসদ জোয়াকিম বাকলা। তিনি তিরকির ভোট কাটতে নির্দল প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এই পরিস্থিতিতে নেপালি এবং রাজবংশীদের ভোট এককাট্টা হয়ে বিজেপি-র বাক্সে পড়লে আলিপুরদুয়ারেও বিজেপি প্রার্থী জয়ী হতে পারেন। বালুরঘাট সংসদীয় কেন্দ্রে বিজেপি-র ভালো সংগঠন আছে। ফলে এখানে জোর লড়াই হবে।

দার্জিলিং আসনটি যে বিজেপি পাবেই সে কথা সি পি এমও জানে। পাহাড়ে সি পি এম দাদাগিরি করতে পারে না। সেখানে গোর্খা নেতা বিমল গুরুংই শেষ কথা বলেন। সি পি এম এবং রাজ্যের প্রধান বিরোধী জোট তৃণমূল ও কংগ্রেস নেতারা এবারে প্রচারের শুরু থেকেই বিজেপিকে বাংলাভাগের চক্রান্তকারী বলে চিহ্নিত করে আক্রমণে গেছে। মিথ্যা প্রচার করেছে যে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব গোর্খাদের জন্য পৃথক রাজ্য গড়তে গোপন চুক্তি করেছে। বাস্তব হচ্ছে যে ভারতীয় সংবিধান ও যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে থেকেই পৃথক রাজ্য গড়ার দাবিটি কেন্দ্রীয় স্তরে আলোচনার জন্য সংসদে পেশ করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

মনে রাখতে হবে যে দার্জিলিং, পাহাড়ের ভৌগোলিক অবস্থান ভারতের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার স্বার্থে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভুটান, বাংলাদেশ, নেপাল সীমান্ত জড়িয়ে আছে দার্জিলিং পাহাড়ের চারপাশে। এই তিনটি প্রতিবেশী দেশে ঘাঁটি গেড়ে বসে থাকা ইসলামি জঙ্গিরা এবং উগ্র কম্যুনিস্ট মাওবাদীরা ওঁৎ পেতে আছে সীমান্ত পেরিয়ে ঢুকে পড়তে। এই রকম একটি অতি সংবেদনশীল অঞ্চলে দুই যুগ ধরে অশান্তি ও আন্দোলন চলতে দিয়ে রাজ্যের বামপন্থী শাসকরাই বিচ্ছিন্নতা-বাদীদের হাতে পশ্চিমবঙ্গসহ সারা ভারতকেই ঠেলে দিয়েছে। গত তিন দশক ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও বামফ্রন্ট সরকার দার্জিলিং পাহাড় এলাকার উন্নয়নে প্রায় কিছুই করেনি। এরই প্রতিবাদে এবং উন্নয়ণের দাবিতে পৃথক গোর্খা রাজ্যের আন্দোলন চলছে। এই উন্নয়ণের প্রয়োজনেই মধ্যপ্রদেশে পৃথক ছত্তিশগড়, বিহারে ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশে পৃথক উত্তরাখণ্ড রাজ্য গঠিত হয়েছে। ঠিক সেই একই প্রয়োজনে অনুন্নত পাহাড়ি এলাকাকে নিয়ে পৃথক রাজ্য গড়া যেতেই পারে। মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ বা বিহারের মানুষ মনে করে না যে, তাঁদের রাজ্যের এক একটি অংশ নিয়ে পৃথক রাজ্য গড়াটা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ষড়যন্ত্র। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে সি পি এম এবং তৃণমূলীরা বাংলা-ভাগ রুখতে হবে বলে এমন প্রচার চালিয়েছে যে তা প্রকারান্তরে পাহাড়ের মানুষের সঙ্গে রাজ্যের সমতলের মানুষের বিভেদ সৃষ্টি করেছে। জ্যোতিবাবুরা ভুলে গেছেন যে বাঙালি কম্যুনিস্টরা একদা বাংলাকে দু টুকরো করে পূর্ব পাকিস্তান গড়তে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন।

জেহাদি পাঠাচ্ছে পাকিস্তান

(১ পাতার পর)

সন্ত্রাসবাদীদের মনোবলে জোর আঘাত করেছে।

প্রধানমন্ত্রী মনেমোহন সিংহ এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চিদম্বরম্ মেনে নিয়েছেন যে, উপরোক্ত অনুপ্রবেশ-এর ফলে ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিঘ্নিত। চিদম্বরম্ আরও বলেছেন যে, পাক-ভিত্তিক সন্ত্রাসবাদী সংস্থা লস্কর এ তৈবা, জৈশ এ মহম্মদ, জামাত উল মুজাহিদিন এতদিন আলাদাভাবে ভারতে সক্রিয় ছিল। এখন তারা একত্রিত হয়েছে। কূপওয়ারা, গুরেজসহ উত্তর কাশ্মীরে ইতিমধ্যে তালিবানদের উপস্থিতি রয়েছে। কূপওয়ারাতে এনকাউন্টার চলাকালীন একজন অল্পবয়সী জঙ্গি ধরা পড়েছে। তার নাম জামির, সে পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশের বাসিন্দা। গোয়েন্দা বিভাগের খবর, এসময়ে জম্মু-কাশ্মীরে ৮০০ থেকে ৯০০ জঙ্গি সক্রিয়। এছাড়া আর এল ও সির ওপারে চার/পাঁচশো জন জঙ্গি ঢোকার অপেক্ষায় রয়েছে।

ইমামকে দিয়ে প্রচার

(১ পাতার পর)

আগেই বুখারি প্রচারে নেমেছিলেন। বুখারি সাহেব ধুবড়ি, বরপেটা, কালিয়াবর এবং গুয়াহাটিতে জনসভায় ভাষণ দিয়েছেন।

এবার বেশ কয়েকটি আসনে এ ইউ ডি এফ কংগ্রেসকে জবরদস্ত চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে। সেই আসনগুলি হল ধুবড়ি, বরপেটা, নওগাঁ এবং কালিঘাবর। কংগ্রেস সর্বতোভাবে মুসলমান ভোট টানার প্রয়াস করলেও এ ইউ ডি এফ অভিবাসী (ইমিগ্র্যান্ট) মুসলমানদের ভোট যে একচেটিয়া পায় তা বলা বাহুল্য এবং দল হিসেবে মুসলমানদের কাছে এ ইউ ডি এফ-এর গ্রহণযোগ্যতা দিন দিন বাড়ছে।

ইয়াহিয়া বুখারি বলেছেন, তিনি নিশ্চিত যে যেখানে যেখানে জনসভা করেছেন, সেখানে মুসলমানরা কংগ্রেসকেই তাদের ভোট দেবেন। তিনি এ ইউ ডি এফ-কে সাম্প্রদায়িক বলে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে বলেন, এ ইউ ডি এফ মুসলমান ভোট ভাগ করে বিজেপি-র জয় সুনিশ্চিত করতে চায়।

বরুণ গান্ধী এবং নগ্ন রাজনৈতিক অভিসন্ধি

(৩ পাতার পর)

হয়েছে, তাহলে ১৯৪৯ সালের ২৬ শে নভেম্বর যা প্রকৃতভাবে ছিল না তাকেই তুলে ধরা হচ্ছে না? এটা কী একধরনের জালিয়াতী নয়? এই ঐতিহাসিক সত্যকে গোপন করা নয়? ২৬ বছর পরে প্রবিষ্ট শব্দগুলিকে ২৬ বছর আগে গ্রহণ করছি বলা যায় কি? তাহলে ১৯৭৬ সালের আগে যারা সংবিধানের নামে শপথ নিয়েছে এখনের দৃষ্টিতে তারা অসংবিধানিক হয়ে যায় না কি? এখন কিছু কিছু লেখক অবলীলাক্রমে লিখে চলেছেন ভারত স্বাধীনতার জন্মলগ্ন থেকেই 'Secular and Socialist'। কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও তার উত্তর আসে না ব্যভিচারী সরকারের তরফ থেকে। এই সরকারই বরুণের সংবিধান বিরোধী কাজের জন্য মাত্রাতিরিক্ত দ্রুততায় বরুণকে কোণঠাসা করে। জেলে ঢোকায়! বরুণ গান্ধীর ভাষণে অস্বাভাবিক কী ছিল? বরুণ, পারিবারিক প্রভাবে দৃশ্যমান অর্দ্ধশিক্ষিত কোনও গান্ধী নয়, বরং লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিক থেকে স্বীকৃতি পাওয়া এক তরুণ। এই তরুণ ভারতের ইতিহাস পড়েছে, জেনেছে 'যতমত ততপথ' দর্শনে সম্পৃক্ত যে ঔদার্য্যে হিন্দুরা তাদের দেশে মসজিদ, চার্চ স্থাপনায় সহযোগিতা করেছে সেই হিন্দুদেরই বলপূর্বক ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরকরণে অথবা নির্মম অত্যাচারে, হত্যায় নিশ্চিহ্নকরণে নিরবচ্ছিন্ন মুসলিম প্রয়াস। স্বাধীনতার পরও দেশীয় প্রশাসকদের ভোটের রাজনীতির জন্য হিন্দুদের প্রতি অত্যাচারের রূপরেখা হয়েছে মাত্র। যাদের জন্য দেশ ভাগ হয়েছে অনন্ত হিন্দুদের মৃতদেহের উপর, তাদের প্রতি পক্ষপাতপূর্ণ আনুকূল্য প্রদর্শন, হিন্দু নিশ্চিহ্নকরণ প্রয়াস জেলায় জেলায় সংখ্যাগরিষ্ঠকরণের সুযোগ করে দেয়। গণতন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত করে তাদের জন্য সবপ্রকার সুযোগ সৃষ্টি করা অথচ হিন্দুদের প্রতি উদাসীন থাকা, হিন্দুদের পক্ষে ক্রমবর্দ্ধমান নিরাপত্তাহীনতার আবহ সৃষ্টি করা যে কোনও তরুণকেই উদ্বিগ্ন ও উত্তেজিত করে তুলতে পারে। শুধু মুসলিমদের স্বার্থ রক্ষায় জনমত গঠন করার প্রয়াস যদি নিন্দনীয় না হয়, শুধু খৃস্টান স্থান রক্ষায় জনমত গঠন করার প্রয়াস যদি নিন্দনীয় না হয়, সুদীর্ঘ অন্যায় অবিচার পীড়নের পশ্চাৎপটে হিন্দুজনমত গঠন নিন্দনীয় কেন হবে? বরুণ এটাই করেছিল। সাম্প্রতিক পিলভিট অঞ্চলে যা ঘটেছে প্রশাসনের দীর্ঘ প্রশ্রায়িত দুষ্কৃতীদের দ্বারা তা একজন তরুণকে উত্তেজিত করতেই পারে। অতীতের কথা যদি বাদও দেওয়া হয়। বর্তমানের ক্রমবর্দ্ধমান হিন্দুপীড়ন সংখ্যাগরিষ্ঠ ৮০ শতাংশ হিন্দুদের দেশে চলবে কেন? কেন লক্ষ লক্ষ হিন্দু পন্ডিতকে জম্মু-কাশ্মীর থেকে উৎখাত হতে হয়? স্বাধীন সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের দেশে? নিরবচ্ছিন্ন হিন্দু পীড়নের ইতিহাস সর্বজনবিদিত ঐতিহাসিক সত্য। তবুও মনে করিয়ে দিই রাষ্ট্রসংঘ পাকিস্থান প্রতিনিধি হিসেবে উচ্চপদে সমাসীন থাকা 'Rediscovery of India'র লেখক আনসার হোসেন খানের মতামত — "Indian Muslims must remember that their forefathers or rather their medieval co-religonist minority rulers over India were beastly and fightful to the Hindus (with exception such as Akbar). No Islam sanctioned their conduct. Temples was indeed demolished and their stones often used to construct mosques on their very site..." এ অতীত ভুলে যাওয়া যেত কিন্তু এখনো অবধি ভোট রাজনীতির জন্য প্রশ্রয়িত মুসলিমদের পরধর্ম অসহিষ্ণুতার কারণে যে কান্ডগুলি প্রায়শই ঘটছে তা প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিতে বাধ্য। বরুণ গান্ধী সেই প্রতিক্রিয়ার শিকার। এবং এ জিনিষ চলতে থাকলে এরকম বরুণ গান্ধীদের উদ্ভব হয়েই চলবে অবাঞ্ছিত হলেও। ভোট রাজনীতির উর্দ্ধে উঠে দেশের স্বার্থে প্রকৃত সেকুলারিজম অনুসরণ করতে হবে সরকারকে। সুস্থ সামাজিক-রাজনৈতিক পরিমন্ডল গঠনের জন্য এদেশের মুসলিমদের দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে। একথা স্বীকার করেই আনসার হোসেন খান আরও জানিয়ে ছিলেন এক সময় "Mr Sahabuddin and Mr M.J. Akbar, blame alone the Imam of the Sahi Mosque in Delhi were barking up the wrong dree... they were only leading the community of Indian Muslims astray by legislations those who took the line might get leadership but that road was destructive. It should be abandoned at once and the foundation laid for a permanent neat re-conciliation. Failing that the flames would rise higher and in the end we could predict exactly which community would suffer most and count the greater number of corpess.

ইসলাম মানে শান্তি — এই ব্যাখ্যার প্রয়াস ব্যর্থ হচ্ছে প্রতিনিয়ত ধর্মান্ধ জঙ্গিদের ব্যাপক তান্ডবে। এ শুধু অমুসলিমদের দৃষ্টিভঙ্গী নয়। ইরানের ইসলামে ধর্মাবলম্বী লেখিকা এবং নারীর অধিকার রক্ষা আন্দোলনের প্রবক্তা আজম কামগুলান International Humanistist and Etnical Union world congress 2002-এর ভাষণে বলেছেন, "মূলতঃ ইসলাম হল মানুষের সমৃদ্ধি, সুখ, সচ্ছল স্বাধীনতা সাম্য এবং জ্ঞানের বিরোধী কিছু বিধি ও বিশ্বাসের গুচ্ছ। ইসলাম এবং পরিপূর্ণ মানবজীবন এরা পরস্পর বিরোধী ধারণা। যে কোনও ভাষ্য অনুযায়ীই হোক না কেন ইসলামে বরাবরই সেকুলারিজম বিরোধী আধুনিক বিরোধী, সাম্য বিরোধী, নারীর অধিকার বিরোধী থেকেছে।" মনে রাখতে হবে এটা লেখকের কোনও মত নয় কারণ তার জন্য পর্যাপ্ত তথ্য তার নেই। পরন্তু এটি ইসলাম ধর্মাবলম্বী ইরানের লেখিকা আজম কামগুলানের মত।

তাহলে প্রশ্ন জাগে এদেশে যে রাজনৈতিক দলগুলি বা যে ব্যক্তি বা যে সাম্যবাদীরা (communist) এই ইসলামের কৃপা প্রার্থী হন ভোটের জন্য তারা আসলে কী? যাদের ভূমিকায় "শাহবানু মামলায় সুপ্রীম কোর্টের রায় এড়িয়ে মুসলিম বিল পাশ হয়ে যায় তারা সেকুলার?

ভারতে সেকুলর'দের এই চরিত্র দেখেই অনসার হোসেন লিখেছেন— India was never secular, is not secular and needs not to be secular. ভারতে যা চলছে তা Secularism'-র আড়ালে Pseudo secularism' । এর চাইতে হিন্দু রাষ্ট্র হলে ভারতে মুসলিমরা নিরাপত্তা বোধ করত। কারণ হিন্দুত্বের সাথে 'Secularism' এক হয়ে থাকে। ইতিহাস তার প্রমাণ। ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতারা তাই ঢাক বাজিয়ে সেকুলার ঘোষণা করেননি রাষ্ট্রকে।

প্রথম আত্মপ্রকাশ বরুণের যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছে তাতেই ভয় পেয়ে গেছে উদ্বিগ্নচিত্ত তাঁর মুলপরিবার। তাই বরুণ গান্ধী 'জামিন' পেলেও আক্রোশের বলি হয়েই থাকবে, সে জঙ্গিদের খতম তালিকায় আছে ইতিমধ্যে রটনো হয়েছে। বরুণ গান্ধী এমন কোনও দৃশ্যমান প্রমাণ বা আনুকুল্য অর্জন করেননি যাতে সে রাহুল গান্ধীর চেয়েও প্রার্থীত লক্ষ্য হয়ে যেতে পারে, যে প্রাণ হারাতে পারে যা জঙ্গি কার্যকলাপ হিসেবেই গণ্য করা হতে পারে। পিতা সঞ্জয় গান্ধীর মৃত্যু রহস্যের মতোই থেকে যাবে আর এক মৃত্যু রহস্য। যদি এরকম কোনও ঘটনা না হয় শেষ অবধি তাহলে দেশবাসীরাই করবে কোনও গান্ধী ভারতীয় উত্থানকে ত্বরান্বিত করবে, কোন গান্ধী ঠিক তাদের সুখ দুঃখ চোখের জল নিয়ে ভাবতে পারবে।

তথ্য সূত্র ঃ (১) Sotsializm ireligiya in Polnoe Sobranie Sochineii Moscow 1960 : Radical Humaniat 41 no2.

(২) সেকুলার রাষ্ট্র ঃ সেকুলারিজম ও ধর্ম— ভাবনা-চিন্তা ১লা জুন ২০০০

(৩) তথ্য সূত্র ঃ Rediscovery of India – Ansar Hossian khan (Orient Longman)

রাজ্য রাজনীতি

প্রায় সব কেন্দ্রেই সি পি এম হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের মুখোমুখি

নিশাকর সোম

এ-রাজ্যে নির্বাচনের দিন এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে দুই যুযুধান পক্ষও তাঁদের লড়াইকে তুঙ্গে তুলছে। ফলে শান্তিপ্রিয় নির্বাচকমণ্ডলী ভীত সন্ত্রস্ত। একমাত্র বিজেপি এখন এরাজ্যে "মার কাটারি" নীতির অনুগামী নয়।

সিপিএম মেদিনীপুরসহ বিভিন্ন জেলার জমি পুনরুদ্ধারের কাজে নেমে পড়েছে। আর বিরোধীপক্ষ সেই অধিকৃত জমি দখলে রাখার জন্য সমস্ত শক্তিকে জড়ো করছে।

সিপিএম প্রায় সব কেন্দ্রেই এক হাড্ডাহাড্ডি লড়াইতে পড়ে গেছে। সিপিএমকে শোচনীয় ভাবে পরাস্ত করা যেত, যদি বিজেপি সহ সার্বিক বিরোধী শক্তির একটি ঐক্যবদ্ধ মঞ্চ গড়ে উঠতো। তা হল না কেবলমাত্র ওয়ান-উওম্যান-শো-এর পার্টির জন্য। আন্দোলন করার জন্য যাঁদের সাহায্য নেওয়া হল — তাঁদের মধ্যে একমাত্র এস ইউ সি-কে একটি কেন্দ্র ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এদিকে এস ইউ সি একাধিক কেন্দ্রে জোট প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রার্থী দাঁড় করাচ্ছে। নেত্রী ঘনিষ্ঠদের বলেছেন, "এই কেন্দ্রগুলিতে এস ইউ সি-এর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। কাজেই ঘাবড়ানোর কোনও কারণ নেই।" এস ইউ সি এই একটি আগমার্কা মার্ক্সবাদী পার্টি যারা সিপিআই এবং সিপিএম-কে বুর্জোয়াদের দালাল বলে আখ্যায়িত করে থাকে। এই এস ইউ সি বলেছে কংগ্রেস যদি নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতিতে সিপিএম-এর সঙ্গে আঁতাত করে সরকার গঠন করে তবে তারা তৃণমূলের সম্পর্ক ত্যাগ করবেন। ধন্য বিপ্লবীয়ানা! এখন কংগ্রেস-তৃণমূল জোট-এর সঙ্গে থাকা যায় — আর তারা যদি সরকার গঠনের জন্য — ওদের ভাষায় বিজেপি রোখার জন্য সিপিএম-এর সাহায্য ভিক্ষা করে তবে এতো উত্মার কারণ কি? এস ইউ সি তো বক্তৃতায় বলছে যে "বিজেপি ফ্যাসিস্ত পার্টি"। এই পার্টিকে রুখে দিতে হবে। আসলে এস ইউ সি'র জয়নগর ছাড়া কোথাও পায়ের তলায় মাটি নেই। তাই নেত্রীর দয়াতে মাটি আঁকড়ে ধরে টগর বোস্টমি সেজে বলছে ঘর করেছি তবে হেঁসেলে ঢুকতে দিইনি। মাওবাদীরা তৃণমূল পার্টিকে আশ্রয় করে চীনের মতোন "ইয়েনান" গড়ার কথা ভাবছে আর মাওবিরোধী লি পি আও নীতি অনুসরণ করে "লাল সন্ত্রাস" সৃষ্টি করে গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার খোয়াবের খোয়াড়ি কাটছে। এই মাওবাদীদের একটি গোষ্ঠী সিপিআই এম-এল (লিবারেশন) পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম এবং সিপিআই-এর বিরোধিতা করছে, আর বিহারে সিপিআই সিপিএম-এর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নির্বাচনে লড়ছে।

এখন এই সমস্ত বিরোধী শক্তিকে এক করে যদি লোকসভা নির্বাচন লড়া যেতো তবে সিপিএম শুয়ে পড়তো। এ প্রসঙ্গে সিপিএম-এর প্রয়াত নেতা — যিনি সিপিএম-এর কলকাতা জেলার সম্পাদক এবং রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন সেই ব্যক্তি হলেন লক্ষ্মী চরণ সেন। তিনি সাংবাদিকদের বলেছিলেন, "সরকারের ক্ষমতায় থাকার ফলে পার্টিটার রক্ত-মাংস চলে গেছে। পার্টি কঙ্কাল হয়ে গেছে। এই কঙ্কাল একবার পড়ে গেলে আর উঠতে পারবে না।" তিনি আমাকে বলেছিলেন, "নীতি নৈতিকতা ভ্রষ্ট সুধাংশু পালিতকে তাড়িয়ে, আমি পার্টিকে ফের গড়ে তুললাম। আর আজ আমাকে সরিয়ে ফসিল নরেন সেনকে কলকাতা জেলার সম্পাদক করার জন্য জ্যোতি বসু নির্দেশ দিচ্ছেন?"

লক্ষ্মীবাবু সুধাংশু পালিত নরেন সেন-এর কেচ্ছা আজ থাক। পরে শোনাব। কারণ পার্টির নোংরা চেহারাটা ফাঁস করা দরকার। প্রসঙ্গত লক্ষ্মী সেনের ছেলের একটি বড় হোটেল আছে।

বর্তমানে দমদম, বনগাঁ, ডায়মন্ড হারবার, হুগলী, উলুবেড়িয়া, রানাঘাট — এই সব কেন্দ্রে সিপিএম-এর পরাজয়ের সম্ভাবনা প্রবল। সম্প্রতি মিট দ্য প্রেস অনুষ্ঠানে ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রবীণ নেতা অশোক ঘোষ বললেন, "মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই গুলি চালানো হয়।" পরে নাকি অশোক ঘোষ বুদ্ধ বাবু-বিমানবাবুদের বলেছেন, তাঁর বক্তব্য বিকৃত করা হয়েছে। বিমান বসু নাকি উষ্মাভরে বলেছেন, "মুখ্যমন্ত্রী তো ঘাসে মুখ দিয়ে চলে না। যাঁরা ঘাস-ফুল করেন তাঁরা এইসব কথা বলে থাকে।" নির্বাচন বড়ই বিষম বস্তু। তার চাপে শরিকদের মাথা নত হবেই!

> **"মাওবাদীরা তৃণমূল পার্টিকে আশ্রয় করে চীনের মতো "ইয়েনান" গড়ার কথা ভাবছে আর মাওবিরোধী লি পি আও নীতি অনুসরণ করে "লাল সন্ত্রাস" সৃষ্টি করে গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার খোয়াবের খোয়াড়ি কাটছে। এই মাওবাদীদের একটি গোষ্ঠী সিপিআই এম-এল (লিবারেশন) পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম এবং সিপিআই-এর বিরোধিতা করছে আর বিহারে সিপিআই সিপিএম-এর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নির্বাচনে লড়ছে।"**

অবশেষে ছত্রধর মাহাতোর জয় হল। পুলিশ ছাড়াই লালগড়ে ভোট হচ্ছে। কি করুণ অবস্থা রাজ্য পুলিশ প্রশাসন তথা সিপিএম সরকারের। আবার একজন নেতা সৃষ্টি করলেন তাঁরা।

কেন্দ্রে মন্ত্রিত্ব করার কামনায় কংগ্রেস ব্যাকুল। তাই প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং থেকে প্রণব মুখার্জি পর্যন্ত বলে ফেললেন, বামদের সঙ্গে ভবিষ্যতে "র‍্যাপো" হবো। তখন মমতাদেবী কি করবেন? তথাগত রায়ের বক্তব্য, মমতা আবার এন ডি এ-এর কোলে ফিরে আসবেনই। নতুবা তাঁদের সর্বভারতীয় "ঠেক" পাওয়ার আর কি উপায় থাকবে?

তবে এটা ঠিক, কংগ্রেস একা সরকার গঠন করার মতো শক্তি পাবে না।

এরাজ্যেও কংগ্রেস-এর ২টি কেন্দ্রে শোচনীয় অবস্থা হচ্ছে বলে বোধ হচ্ছে।

অন্য রকম

বিশ্বাসে মিলায়ে বস্তু

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। সামান্য কিছুটা জায়গা। তাতে না আছে কোনও আচ্ছাদন। না কোনও কাঠামোর বেষ্টন। চারদিক উন্মুক্ত। ফাঁকা মাঠ। চারপাশে বিক্ষিপ্তভাবে জমে রয়েছে মাটির ঢেলা। খোলা মাঠের মধ্যে জায়গাটা আলাদা করে সনাক্ত করারও কোনও উপায় নেই। তবে উত্তরপ্রদেশের সারভন গ্রামের বাসিন্দারা এই জায়গার মূল্যায়ণ এভাবে করতে রাজি নয়। তাদের কাছে এ জায়গার মূল্য অনেক। এই মাটি শুধু মাটি নয়। পবিত্র ভূমি। গ্রামের কচি-কাঁচাদের কাছেও এই ভূমি পবিত্র। গ্রামের প্রবীণরা কচি-কাঁচাদের মাটি ছুঁয়ে প্রণাম করতে বলেন। যাতে তারা বড় হয়ে প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠে। গ্রামবাসীদের বিশ্বাস তাদের সন্তান যেন মাটির স্পর্শ থেকে বঞ্চিত না হয়।

কী এমন রয়েছে এখানে?

উত্তরপ্রদেশের উন্নাও জেলার অন্তর্গত সারভন গ্রাম। গ্রামটি আকার আয়তনে ছোটো। এখানেই রামায়ণের শ্রবণ কুমার প্রাণত্যাগ করেন। অন্ধ পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান ছিলেন তিনি। শ্রবণ কুমার পিতা-মাতাকে দুই দিকে দুই ঝুড়িতে করে তীর্থ ভ্রমণে নিয়ে যাচ্ছিলেন। পথ মাঝে তাঁদের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। দায়িত্ববান, কর্তব্য পরায়ণ, মাতৃ-পিতৃ ভক্ত শ্রবণ কুমারের মৃত্যু স্থান তাই গ্রামবাসীদের কাছে পবিত্রস্থান। তীর্থস্থান। গ্রামের প্রতিটি মানুষ চায় তাদের সন্তান যেন শ্রবণ কুমারের মতো হয়। সারভন ও তার পার্শ্ববর্তী গ্রামের বাসিন্দারা প্রতি সোমবার এখানে নিয়মিত

এই সেই পুণ্যভূমি।

জন্য নদীতে জল আনতে গেলে, দশরথের নিক্ষিপ্ত বাণে প্রাণ হারান তিনি। দশরথের হরিণ শিকারের তীরে শ্রবণ কুমারের আকস্মিক মৃত্যু হয়। দশরথ শ্রবণ কুমারের পিতা-মাতাকে ছেলের মৃত্যু সংবাদ জানালে, তাঁরা পুত্রশোকে সেখানেই প্রাণ হারায়। পুত্রশোকে কাতর মা-বাবা অভিশাপ দেন দশরথকে — তুমিও পুত্রশোকে প্রাণ হারাবে। পরবর্তীতে দশরথ সেই অভিশাপেই পুত্রশোকে মারা যান। রামায়ণের এই ঘটনা অনেকেরই জানা। কিন্তু জানা নেই এই মাটির কথা।

শ্রবণ কুমারের স্মৃতিতেই এই গ্রামের নাম হয়েছে 'সারভন'। এখানেই শ্রবণ কুমার উপস্থিত হয়। ভক্তি ও বিশ্বাসের টানে অন্যান্য গ্রাম থেকেও অনেকে আসেন। বাদ থাকেন না দূর দূরান্তের দর্শনার্থীরাও। সারভনের পুণ্যভূমিকে দর্শন করে নিজেদের ধন্য মনে করেন তারা।

শ্রবণ কুমারের মৃত্যু ক্ষেত্র সাধারণ মানুষের কাছে অলিখিত তীর্থস্থান। দূরান্তের মানুষের সমাগম হলেও, প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে এক্ষেত্র এখনও বঞ্চিত। একে নতুন করে গড়ে তোলা হয়নি। নির্মাণ করা হয়নি কোনও স্মারক বা মন্দির। তবুও সাধারণ মানুষের কাছে এটা তীর্থক্ষেত্র — পুণ্যভূমি।

পুলিস নির্বিকার

মালদায় হিন্দু গ্রামে হামলা চালাচ্ছে মুসলিম দুষ্কৃতীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ মালদা ।। মালদা জেলার বৈষ্ণবনগর থানার কৃষ্ণপুর - শ্যামটোলা গ্রামে গত ১৪ এপ্রিল রাতে ইলেকট্রিক হাতা ফেলে পার্শ্ববর্তী মুসলিম পাড়া মাদারীটোলা অন্ধকার করে দিয়ে চার -পাঁচ শো দুস্কৃতী হামলা চালায় এবং ২২টি হিন্দু বাড়ি ভাঙচুর করে। তিন জন হিন্দু বোমার আঘাতে আহত হয়। পরদিন সকালে আবার মাদারীটোলার দুস্কৃতীরা হিন্দুদের বাড়িতে হামলা চালালেও পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। ঘটনার সূত্রপাত দাদন (বাইরে কাজ করতে যাওয়ার)-এর টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে। একজন হিন্দু শ্রমিক মাদারীটোলার এক মুসলিম শ্রমিকের কাছে টাকা চাইতে গেলে বচসা হয়। তারপর ১৪ এপ্রিল রাতে বোমা পিস্তল এবং মাস্কেট নিয়ে পরিকল্পিতভাবে প্রতিবেশী কৃষ্ণপুর-শ্যামটোলার পুষ্প মণ্ডল, সুভাষ সিংহ, ভিকুরাম মণ্ডল, জিতেন্দ্রনাথ সিংহ, দ্বিজেন মন্ডল, সুজিত সাহা, সন্তোষ সাহা, চিত্তরঞ্জন সরকার, বিহারীলাল সরকার, অমল মন্ডল, সন্তোষ সাহা সমেত ২১টি বাড়িতে (বোমা নিয়ে) হামলা চালায়। বোমার আঘাতে অজিত ঘোষ (৩০), তরুণ মন্ডল (২৫) আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি আছে। রাত্রে হামলা চালানোর সময় পুলিশকে খবর দেওয়া হলে সিপিএমের এক মুসলিম নেতা পুলিশকে হিন্দু গ্রাম কৃষ্ণপুরে যেতে দেননি। মুসলিম নেতার বক্তব্য, তেমন কিছু গণ্ডগোল হচ্ছে না। পরে আবার ফোন করা হলে বাড়ি-ঘর ভাঙচুর করার পর পুলিশের গাড়ি আসে। কিন্তু পুলিশ আসার পরও ষষ্ঠী সাহার মিষ্টির দোকান লুট করে মুসলিম দুস্কৃতীরা। হালখাতার প্রচুর মিষ্টি দোকানে রাখা ছিল। ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা গেল পুলিশের একটি জিপ রয়েছে। স্থানীয় হিন্দু বাসিন্দাদের মধ্যে পুলিশের প্রতি প্রচন্ড ক্ষোভ। চিত্তরঞ্জন সরকার তার কাপড়ের দোকান দুস্কৃতীরা লুট করে নিয়ে গেছে দেখালেন। দোকানে ২৫-৩০ হাজার টাকার কাপড় ছিল।

দুষ্কৃতীদের আক্রমণে বিধ্বস্ত দোকান-ঘর

সুভাষ সিংহের স্ত্রী দিপালী সিংহ সেই ভয়ঙ্কর রাত্রের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে কেঁদে বললেন, আমার হাত ধরে টেনে ফেলে দিয়েছে। সোনার অলঙ্কার, দশ বারো হাজার টাকা সব লুট হয়ে গেছে। দুস্কৃতীদের নেতা আকবর শেখ চিৎকার করে মুসলিমদের বলেছে, হিন্দুদের সব শেষ করে দে, টাকা পয়সা যা লাগে আমি দেব। এই আকবর শেখ একজন কুখ্যাত চোরাকারবারী। পুলিশের খাতায় তার নাম থাকলেও রাজনৈতিক আশ্রয়ে ঘুরে বেড়ায়।

চড়ক পূজার জন্য কৃষ্ণপুরে হিন্দু গ্রামের আজাদ শেখ, হান্নান শেখ, মান্নান শেখ, জাকির হোসেনরা হিন্দু বাড়িতে আক্রমণ চালালেও পুলিশ একজনকেও গ্রেপ্তার করেনি।

পুলিশের এ এস আই সুবীর মহান্তকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে — তিনি বলেন, আমি কিছু বলতে পারবো না। যা বলার আমাদের আই সি বলবেন। অথচ স্থানীয় মানুষ জানালো এই সুবীর মহান্তই সেদিন ঘটনাস্থলে ছিলেন।

উল্লেখ্য, পরদিন ছোট ছেলেদের সামনে রেখে মুসলিম দুস্কৃতীরা কৃষ্ণপুর গ্রামে হামলা চালিয়েছিল। পুলিশ চোখের সামনে বোমা পিস্তল নিয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখেও গায়ে হাত বুলিয়ে মুসলিমদের সরিয়ে দিয়েছে। এখানে বলা প্রয়োজন, এই মাদরীহাট গ্রামের মুসলিম দুস্কৃতীরা জাল নোটের কারবার এবং বাংলাদেশের সাথে চোরাকারবার ও মোটর সাইকেল চুরি করে বাংলাদেশে পাচারের সঙ্গে যুক্ত। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত থাকারও অভিযোগ রয়েছে। অথচ পুলিশ প্রশাসন নির্বিকার। আই সি রাজেন্দ্র বাবুর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, আমরা দুস্কৃতীদের ধরার জন্য রেড করছি, কিন্তু তারা পালিয়ে বেড়াচ্ছে। আসলে ভোটের মুখে সিপিএম এবং কংগ্রেস মুসলিম ভোট ব্যাঙ্কে আঘাত করতে চায় না। এই জন্যই দুস্কৃতীরা ধরা পড়ছে না।

রাজনৈতিক ফয়দা তুলতে গিয়ে উন্নয়ণ ব্যাহত অসমে

সংবাদদাতা ।। প্রধানমন্ত্রীর রাজ্য অসমেই ৩৯১টি উন্নয়ণ প্রকল্প গত কুড়ি বছর ধরে ঝুলে আছে। সরকারি রেকর্ডেই ওই অসম্পূর্ণ প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে সেচ প্রকল্প, পি ডব্লিউ ডি (রোড), পি ডব্লিউ ডি (বিল্ডিং), জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগ, জল-সম্পদ উন্নয়ণ-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলি। গত পাঁচ থেকে কুড়ি বছরের মধ্যে শুরু হয়ে শেষনা হওয়া প্রকল্পে ইতিমধ্যে ৩৫৭ কোটি টাকা জলের মতো খরচ হয়ে গেছে। সরকারি রেকর্ডেই বলছে — উপরোক্ত অসম্পূর্ণ প্রকল্পগুলির মধ্যে আলাদাভাবে সেচ দপ্তরে ২৮ কোটি, পি ডব্লিউ ডি (রোড)-তে ২৪৭ কোটি, পি ডব্লিউ ডি (বিল্ডিং)-এ ২৬ কোটি, জনস্বাস্থ্য-কারিগরি বিভাগে ২৬ কোটি এবং জলবিভাগে ৪৬ কোটি টাকা আটকে পড়ে আছে।

সরকারি সূত্রানুযায়ী ৩১ মার্চ ২০০৮ পর্যন্ত ঝুলে থাকা প্রকল্পগুলিতে (৩১১টি) মোট ৩৭৫.২৭ কোটি টাকা খরচ হওয়ার কথা। এসবের মধ্যে ১২০ টি সেচ প্রকল্পের খরচই ২৮.৭৩ কোটি টাকা। ওই ৩৯১টি অসম্পূর্ণ প্রকল্পের মধ্যে ২৪৯ টি প্রকল্পের ব্যয় ৩২৫.১৭ কোটি টাকা — যা গত পাঁচবছর ধরে খরচ করেও প্রকল্পটি অসমাপ্ত। ৩৪ কোটি টাকার অন্য পাঁচটি প্রকল্প বিগত পাঁচ থেকে দশ বছর ধরে অসম্পূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। ৩.২২ কোটি টাকার দশটি প্রকল্পের কাজ গত দশ থেকে ২০ বছর যাবৎ শম্বুকগতিতে চলছে, ৮৮ লক্ষ টাকার পাঁচটি প্রকল্প গত ২০ বছর ধরেই চলছে তো চলছেই। শেষ হওয়ার লক্ষণ নেই।

অথচ কংগ্রেস দল পরিচালিত তরুণ গগৈ সরকার ক্ষমতায় বসেই ঘোষণা করেছিল যে, প্রয়োজনীয় সব প্রকল্পের কাজ দ্রুত শেষ করা হবে। আর যে সব কাজের প্রয়োজনীয়তা নেই সেগুলিকে পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হবে। প্রথম দিকে রাজ্যের পরিকল্পনা ও উন্নয়ণ দপ্তর বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। তারপর যে কেন থেমে গেছে তা সরকারই ভালো জানে। বিশেষজ্ঞদের মতে, কোনও প্রকল্প শুরু করার আগে তার প্রয়োজনীয়তা, তহবিলের

মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ

ব্যবস্থা, সম্ভাব্য ব্যয়, প্রভৃতি খতিয়ে দেখা হয়। কিন্তু অসমে দেখা যাচ্ছে কার্যক্ষেত্রে এসব কিছুই হয়নি। কোনও একটি প্রকল্প থেকে কতটা রাজনৈতিক ফায়দা ওঠানো যায়, শাসক কংগ্রেস দল তা দেখেই সব ঠিক করে। আর রাজনৈতিক ফায়দা তোলার পর মাঝপথেই সেই সব প্রকল্প অসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে থাকে। তাছাড়া একটা প্রকল্প শুরু করার পর তাকে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করার কোনও সরকারি নীতি বা ব্যবস্থা আদৌ নেই। সেজন্য লোকেঠাট্টা করে বলে — অসমে সবকিছুই চলে 'লাহে লাহে' অর্থাৎ ধীরে ধীরে।

এই 'লাহে লাহে' কর্মসংস্কৃতির সঙ্গে রাজনৈতিক সুবিধাবাদ জড়িয়ে গিয়েছে। বছরের পর বছর অসমাপ্ত থেকে যাচ্ছে প্রকল্প।

শিরোমণি গুরুদ্বার কমিটি প্রধানমন্ত্রীর প্রতি ক্ষুব্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ-র ভূমিকায় বেশ ক্ষুব্ধ শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটি (এম জি পি সি)। প্রধানমন্ত্রী রূপে মনমোহন সিং গত পাঁচ বছরে শিখদের জন্য কিছুই করেননি বলে অভিযোগ করলেন এস জি পি সি-র সভাপতি অবতার সিং মাক্কার। প্রধানমন্ত্রীর অবস্থানে তারা এতটাই ক্ষিপ্ত যে, আগামী দিনে এজন্য কোনও শিখকে প্রধানমন্ত্রীরূপে দেখতে চান না। তিনি মনমোহনকে শিখ নন বলেও এদিন কটাক্ষ করেন। তাঁর মতে 'মনমোহন সিং ইজ নট এ শিখ'। এই প্রসঙ্গে শ্রী মক্কার বলেন, 'মনমোহন সিংহ-র কাছে আমরা শিখদের পক্ষ থেকে ১৩টি দাবি রেখেছিলাম। কিন্তু তিনি গত পাঁচ বছরে তার একটিও পূরণ করেননি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এস জি পি সি শিখ সমাজের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান। সমিতিরই নির্দেশে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীকে জুতা পালিশ করে করসেবা করতে হয়েছিল। সমিতি আকালি দলের অন্যতম সমর্থক। ইতিমধ্যে তারা পাঞ্জাবে প্রচার-অভিযান চালাচ্ছে। এদিনের এক প্রচার-অভিযানেই শ্রী মাক্কার প্রধানমন্ত্রীর কঠোর সমালোচনা করেন। পাঞ্জাবে তারা কংগ্রেসকে কোনও রাজনৈতিক সুবিধা দিতেও রাজি নয় বলে প্রবন্ধক কমিটি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে। ইতিমধ্যেই সাধারণ শিখদের মধ্যে কংগ্রেস বিরোধী হাওয়া উঠেছে। শিখ দাঙ্গার অন্যতম পান্ডা টাইটলারকে ক্লিন চিট দেওয়া নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে শিখদের মধ্যে। শিখ সাংবাদিক জার্নাল সিং কয়েকদিন আগে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদম্বরম্-কে জুতো ছোঁড়েন।

অবতার সিং মাক্কার তাঁর ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ করে বলেন, মনমোহন সিং শিখদের এতটাই অবমাননা করেছেন যে, আমরা এজন্য আগামী দিনে প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতির মতো টপ পোস্টে কোনও শিখকে দেখতে চাই না। এই প্রসঙ্গে তিনি জ্ঞানী জৈল সিং-এর প্রসঙ্গও তুলে ধরেন।

কংগ্রেস ও ডঃ মনমোহন সিং-এর বিরুদ্ধে এস জি পি সি-র অবস্থান রাজনীতিতে ভালো প্রভাব ফেলবে বলে মনে করছে তথ্যাভিজ্ঞ মহল। শিখদের বিক্ষোভ কংগ্রেসকে বেকায়দায় ফেলতে পারে বলেও অনেকে মনে করছেন।

এক ঝলকে

এবারের লোকসভা নির্বাচনে কোটিপতি প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। এসময় ভারত জুড়ে লোকসভার নির্বাচনী মহাযজ্ঞ চলছে। তাবড় নেতা-মন্ত্রীরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, পদযাত্রা, হুডখোলা জীপযাত্রা থেকে শুরু করে হাওয়াই (উড়োজাহাজ / হেলিকপ্টার) সফর করে চলেছেন। দ্বিতীয় দফার নির্বাচন শেষ। ইতিমধ্যে দেখা যাচ্ছে দলে দলে কোটিপতিরা দেশসেবার মহান কাজে রাজনীতিতে নিজেদের উৎসর্গ করছেন। নির্বাচন কমিশনের দৌলতে বাধ্য হয়ে নির্বাচন প্রার্থীরা তাঁদের গচ্ছিত সম্পদের বিষয়ে হলফনামা জমা দিয়েছেন। দেখা গেছে, বামপ্রার্থীরাও কেউ কেউ বিদেশী ব্যাঙ্কে বিপুল পরিমাণ অর্থ গচ্ছিত রেখেছেন। উত্তর কলকাতা কেন্দ্রের সি পি এম প্রার্থী ও সাংসদ তথা দলের হোলটাইমার মহম্মদ সেলিমই পার্টি করে ব্যাঙ্কে ৪৪ লক্ষ টাকা জমিয়েছেন। তাঁর স্ত্রী রোজিনা খাতুনের জমানো টাকার পরিমাণ সাড়ে তের লক্ষ টাকা। এছাড়া দুই ছেলে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ব্যাঙ্কে জমিয়েছে ৭ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা। ঘোষিত সূত্র অনুযায়ী

এন নাগেশ্বর রাও

আবু আজমি

সেলিমের আরও রয়েছে তিন লক্ষাধিক টাকার স্বর্ণালঙ্কার। তবে প্রথম ফ্রন্ট, দ্বিতীয় ফ্রন্ট ও তৃতীয় ফ্রন্টের নেতাদেরও টাকার কমতি নেই। প্রথম দফার ভোটে কোটিপতিদের ছড়াছড়ি। (সরণী ১ দ্রষ্টব্য)

চতুর্দশ লোকসভায় নির্বাচিত সাংসদদের সম্পত্তির গড় হিসেবটা ছিল ১.৬৪ কোটি টাকা। বেশির ভাগ কোটিপতি সাংসদ ছিলেন কংগ্রেস দলের। আবার তাদের মধ্যে বেশির ভাগ এসেছিলেন পাঞ্জাব, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্র থেকে। বিগত লোকসভায় প্রার্থীদের মধ্যে নয় শতাংশই ছিলেন কোটিপতি। পঞ্চ দশ লোকসভায় এখনও পর্যন্ত যে খবর এসেছে তাতে মোট প্রার্থীর ১৪ শতাংশ কোটিপতি প্রার্থী। এখনও অনেক আসনে মনোনয়ন পেশই হয়নি। তাতেই গতবার থেকে পাঁচ শতাংশ বেশি কোটিপতি দেখা যাচ্ছে। পরিসংখ্যানই বলছে যে, কর্ণাটকে জনতা দল (দেবেগৌড়া) প্রার্থীদের হাতে ১৯.১ কোটি, বিজেপি প্রার্থীদের ৭.২৭ কোটি এবং কংগ্রেস প্রার্থীদের হাতে ৪.৬৭ কোটি টাকা রয়েছে। ব্যাঙ্গালোর দক্ষিণ কেন্দ্রে জনতা দল (ডি) প্রার্থী সুরেন্দ্রবাবু ১০৮ কোটি টাকার মালিক। তিনিই রাজ্যে সবথেকে ধনী প্রার্থী। বিজেপি-র অশ্বথনারায়ণ-এর রয়েছে ৫২ কোটি টাকার সম্পত্তি। এছাড়া প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এইচডি কুমারস্বামীর রয়েছে ৪২ কোটি টাকার সম্পত্তি। (সরণী ২ দ্রষ্টব্য)

এইচ ডি কুমারস্বামী

রেনুকা চৌধুরী

অন্ধ্রপ্রদেশে প্রথম দফার ভোটে ৬৪ জন কোটিপতি প্রার্থী ছিলেন নির্বাচনী লড়াইয়ে। এদের মোট সম্পত্তির পরিমাণ মাত্র ৮১২ কোটি টাকা। বিজয়ওয়াড়া থেকে কংগ্রেস প্রার্থী এল রাজগোপাল ২৯৯ কোটি, খম্মাম থেকে টি ডি পি প্রার্থী কে এন নাগেশ্বররাও ১৭০ কোটি, পেড্ডপোল আসনে প্রার্থী জি বিবেকানন্দ ৭২ কোটি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রেণুকা চৌধুরী ৩৮ কোটি

প্রিয়া দত্ত

দেবেন্দ্র সিং যাদব

এবং মুখ্যমন্ত্রী রাজশেখর রেড্ডির পুত্র জগমোহন রেড্ডি তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ ৭৭ কোটি টাকা ঘোষণা করেছেন।

এমনকী ঝাড়খণ্ডের মতো রাজ্যেও কোটিপতিরা দুর্লভ নন। হাজারিবাগ থেকে কংগ্রেস প্রার্থী সৌরভ নারায়ণ সিং ৮৫ কোটি টাকার সম্পত্তির হিসাব দাখিল করেছেন। এখানে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী যশবন্ত সিন্‌হার সম্পত্তি-র পরিমাণ ৩.৫৭ কোটি টাকা। ঝাড়খণ্ডেরই লোহারদাগা কেন্দ্রের প্রার্থী কেন্দ্রীয় জনজাতি দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী রামেশ্বর ওঁরাও, এর সম্পত্তির পরিমাণ ২.৩৫ কোটি টাকা। ওড়িশার বিজু জনতা দল সবথেকে বেশি সংখ্যক কোটিপতি প্রার্থী দাঁড় করিয়েছে। পুরী কেন্দ্রে বিজেডি প্রার্থী পিনাকী মিশ্রের একক সম্পত্তির পরিমাণ মাত্র ২৯.৭ কোটি টাকা। অসমের বিতর্কিত সাংসদ ও কংগ্রেস প্রার্থী মণিকুমার সুবরা তেজপুর কেন্দ্রে প্রার্থী। তাঁর ঘোষিত সম্পত্তির মূল্য ৬০ কোটি টাকা। মহারাষ্ট্রের বারামতী কেন্দ্রে এন সি পি-র টিকিটে দাঁড়িয়েছেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শারদ পাওয়ারের সুকন্যা সুপ্রিয়া সুলে। তিনিও জানিয়েছেন তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ ৫২ কোটি টাকা। (সারণী ৩ দ্রষ্টব্য)

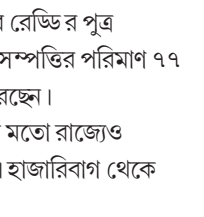
ডি পুরনদেশ্বরী

মিলিন্দ দেওরা

যশবন্ত সিংে

সারণী-১

দল	কোটিপতি প্রার্থী	প্রথম দফার ভোটে মোট প্রার্থী সংখ্যা
কংগ্রেস	৪৫	৯৩
বিজেপি	৩০	৭৮
বহুজন সমাজবাদী পার্টি	২৩	৮৮
নির্দল	২২	৬১৯
প্রজারাজ্যম্	৯	২৮
সমাজবাদী পার্টি	৮	২৩
টি আর এস	৭	৯
তেলেগু দেশম্ পার্টি	৭	১১
শিবসেনা	৪	৮
জনতা দল (ইউ)	৪	১২
রাষ্ট্রীয় জনতা দল	৪	১৬
রাষ্ট্রীয় ক্রান্তি দল	৪	৮
লোক জনশক্তি পার্টি	৩	১৬
বিজু জনতা দল	৩	৯
পিরামিড পার্টি	২	১৭
এ ইউ ডি এফ	২	৪
বিবিএম	২	১২
মানা পার্টি	২	২
জে বি এম	২	৭
আর এস এম ডি	১	৩
আর পি আই (এ)	১	৫
বসপা (এস)	১	১২
বি এস কে ডি	১	৩
সি পি এম	১	৭

সারণী-২

কয়েকজন বিশিষ্ট কোটিপতি প্রার্থী

নাম	দল	কেন্দ্র	সম্পত্তির পরিমাণ (কোটি টাকা)
দীপক ভরদ্বাজ	বি এস পি	পশ্চিম দিল্লী	৬২২
খিমজী ভাই	জয়হিন্দ্ সেনা	সুরেন্দ্রনগর (গুজরাট)	৫১৪
রাজাগোপাল	কংগ্রেস	বিজয়ওয়াড়া (অন্ধ্র)	২৯৯
কুওরসিং তনওর	বিএসপি	দক্ষিণ দিল্লী	১৭৫
আবু আজমি	সমাজবাদী পার্টি	পশ্চিম মুম্বই	১২২
চন্দ্রবাবু নায়ডু	টি ডি পি	কুপ্পম্ (অন্ধ্র)	৬২
মানেকা গান্ধী	বি জে পি	আম্বলা (হরিয়ানা)	১৫
প্রফুল্ল প্যাটেল	রাষ্ট্রীয় ক্রান্তি পার্টি	গোন্দিয়া (মহারাষ্ট্র)	৩৮

সারণী-৩

প্রথম দফায় রাজ্য অনুসারে কোটিপতি প্রার্থী

প্রদেশ	কোটিপতি প্রার্থী	মোটপ্রার্থী	শতাংশের হিসেবে
অন্ধ্রপ্রদেশ	৮৪	৩১৪	২০.৩৮
উত্তরপ্রদেশ	৩৫	২৬৮	১৩.০৮
মহারাষ্ট্র	২৯	২৪২	১১.৯৮
বিহার	২৩	২০০	১১.৫০
ঝাড়খণ্ড	৭	৭৯	৮.৮৬
ছত্তিশগড়	৭	১৭১	৪.০৯
অরুণাচল প্রদেশ	৪	৮	৫০.০০
অসম	৪	৩৬	১১.১১
জম্মু-কাশ্মীর	৪	২১	১৯.০৫
লাক্ষা দ্বীপ	২	৪	৫০.০০
নাগাল্যাণ্ড	১	৩	৩৩.৩৩

বিদেশে গোপনে গচ্ছিত কালো টাকা ফিরিয়ে আনতে সরকার নীরব কেন?

এস গুরুমূর্তি

অনুমান যে, ৫০ হাজার কোটি ডলার (টাকার অঙ্কে ১ লক্ষ ২৫ হাজার কোটি টাকা) দেশের বাইরে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রয়েছে। অর্থনীতির পরিভাষায় একে পুঁজি পলায়ন বলে ব্যাখ্যা করা হয়। এই বিপুল অর্থ-দেশের মানুষেরই। কিন্তু কর ফাঁকি দেওয়ার জন্য যা গোপনে বিদেশের বিভিন্ন ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রয়েছে।

সুইজারল্যাণ্ডকে কালো টাকা জমা রাখার কেন্দ্র হিসেবে মনে করা হয়, ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কালো টাকা প্রচুর পরিমাণে এখানে জমা পড়ে। এই কথা নির্বাচনী প্রচারের প্রাক্কালে কেবলমাত্র লালকৃষ্ণ আদবানী-ই বলেননি, গতবছর দিল্লীতে খোদ সুইস রাষ্ট্রদূত এক অনুষ্ঠানে একথা কবুল করেন। ওই ভারত-সুইস মৈত্রী সন্ধির ষাট বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি স্বীকার করেন যে, তাঁর দেশের ব্যাঙ্কে বহু ভারতীয়ের প্রচুর কালোধন গচ্ছিত আছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এও বলেন যে, কালো টাকা সে দেশে আসার ব্যাপারে কোনও নতুন প্রতিবন্ধকতার আইন না থাকলেও, কিছু ক্ষেত্রে এই অর্থ আসাকে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

সুইস দূত একথাও বলেন যে, শুধুমাত্র সেই দেশের ব্যাঙ্ক নয়, পৃথিবীর বহু দেশেই এমন কালাধন পাচার হয়ে থাকে। আমেরিকার এক হিসেব অনুযায়ী, বিশ্বের ৩৭টি দেশে রয়েছে এইসব গুপ্তধন। এইসব কালো টাকার মালিকরা হন ঘুষখোর ব্যবসায়ী, ভ্রষ্ট রাজনীতিক, ধান্ধাবাজ জনসেবক, ড্রাগ চোরাচালনকারীসহ ডি-কোম্পানীর মতো অপরাধী সংস্থাগুলির মালিক। কেবল এই কালোধনের মালিকের নাম এবং গুপ্ত অর্থের পরিমাণ জানা যায় না। কিন্তু সুইস ব্যাঙ্কে ভারতীয়দের কত অর্থ জমা আছে? এই অর্থ পরিমাণ কত তা পরে আলোচনা করা যাবে, কিন্তু এ সম্পর্কে আরেকটা কথা বলব।

শুরুতেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। ব্যক্তিগত ভাবে ওই বিষয়ের সম্পর্কে কিছু জানা আছে। গত শতকের শেষ দিকে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের পক্ষ থেকে রিলায়েন্স দুর্নীতির বিষয়ে তদন্ত করতে গিয়ে বিদেশে গুপ্তধনের সন্ধানে ভারতীয়দের জমা অর্থের সন্ধান করার চেষ্টা চালিয়েছিলাম। এই তদন্তে আমেরিকার এক গোয়েন্দা সংস্থা 'ফেয়ারফ্যাক্স'-এর সঙ্গে পরিচিত হই। ওদের নিপুণতা দেখে আমি ভারত সরকারকে পরামর্শ দিই যে, সরকার দেশের বাইরে গুপ্তধন অনুসন্ধানের জন্য যেন এদের সাহায্য নেয়। 'ফেয়ারফ্যাক্স' একাজে সম্মত হল। কিন্তু পারিশ্রমিক হিসেবে কোম্পানীর উদ্ধার করা কালোধনের পার্সেন্টেজ চাইল। সুইস সূত্র জানালো ওই দেশে সেই সময়ে ৩০ হাজার কোটি ডলার গুপ্তধন গচ্ছিত রয়েছে শুধু ভারতীয়দেরই। এই বিপুল অর্থ ফেয়ার-কে আকৃষ্ট করার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু আমার প্রয়াসে জল ঢেলে দিল ১৩ মে ১৯৮৭-তে সিবিআই কর্তৃক গ্রেপ্তার। আমাকে যে অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হল, তা পরে খারিজ হয়ে যায়। কিন্তু তদন্তে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে এই গ্রেপ্তারই যথেষ্ট ছিল। সমস্ত দেশ জানে যে, সেই তদন্ত বন্ধ করার পশ্চাতে কারণ ছিল যে, বোফর্স দালালী এবং ক্ষমতাসীন পরিবারের বিদেশে গচ্ছিত কালোধনের সুলুক সন্ধান ছিল এই তদন্তের দিশা। সেই সময়ে রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী এবং তিনি বিনোদ পাণ্ডে আর ভুরেলালের মতো সভ্য ইমানদার অফিসারদের তদন্ত থেকে সরিয়ে দিলেন। এমনকী তদন্তের নির্দেশ দেওয়াতে সেই সময়ের বিত্তমন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপকেও পদচ্যুত হতে হল।

গচ্ছিত কালো টাকা উদ্ধারের দাবি জানাচ্ছেন শ্রীআদবানী ও এস গুরুমূর্তি।

অবৈধ ধন আধুনিক পুঁজিবাদের এক ঘৃণ্য পরিণাম। কিন্তু ৯/১১ আতঙ্কবাদী হামলার পর আমেরিকাও বুঝল যে, কেবলমাত্র ব্যবসায় উপার্জিত কালাধন এইসব জায়গায় গচ্ছিত থাকে না, উপরন্তু ওসামা বিন লাদেনের মতো অপরাধীরাও এসব ব্যাঙ্কে তাদের অর্থ সুরক্ষিত রাখে এবং দুনিয়াকে কব্জা করতে তা কাজে লাগায়।

অবৈধ অর্থের ওপর প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে এক সংস্থা তৈরি হয়েছে যার নাম 'গ্লোবাল ফাইনান্সসিয়াল ইন্টিগ্রিটি'। এই সংস্থাটি বিভিন্ন দেশে জমা কালো ধনের ওপর সমীক্ষা চালিয়ে এক অনুমান সাপেক্ষ রিপোর্ট তৈরি করেছে। এই অনুমান বলছে যে, ২০০২ থেকে ২০০৬ এই চার বছরে প্রতিবছরে ভারত থেকে ২৭৩৩ হাজার কোটি ডলার অর্থ বিদেশে জমা পড়েছে। ৫ বছরে মোট ৩৭০ হাজার ৫০ কোটি ডলার বিদেশে পাচার হয়ে গেছে। অর্থাৎ ৫ বছরে মোট ৬৮.৮ হাজার কোটি টাকা ভারত থেকে পাচার হয়ে গেছে। এর থেকে অনুমান করা যায় বিগত ৬২ বছর কী বিপুল অর্থ বিদেশে জমা হয়েছে।

এই বিপুল অর্থের কিয়দংশও যদি দেশে ফেরৎ আনা যায় দেশের কত লাভ হয় — এই বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা যেতে পারে। এই অর্থের সাহায্যে দেশের সমগ্র বিদেশী ঋণ মেটানো যায়। এই অর্থের পরিমাণ কেবল ২২ হাজার কোটি ৭ ডলার। এত বিপুল অর্থ দেশে ফিরলেই দেশ বৈভবশালী হতে পারে। তাহলেই আমরা ১০-১৫ টাকা দিলেই এক ডলার কিনতে পারি, যা কিনা আজ ৫০ টাকায় পাই। আজ পেট্রোল কিনি ৪৫ টাকায়, যা কিনতে পারতাম মাত্র ১৫ টাকা লিটার দিয়ে। আমদানি ব্যয় অর্দ্ধেক থেকে এক তৃতীয়াংশ হয়ে যেত।

ভারত এত কম খরচে দ্রব্য তৈরি করতে পারত যে, রপ্তানিতে ছুট দেবার দরকার হত না। এইসব বিষয়গুলি বাস্তব হতে থাকলে ভারত অন্যদেশ থেকে ঋণ না নিয়ে, বরং অন্য দেশকে ধার দিতে পারত। বাসগৃহ নির্মাণে সস্তায় টাকা পাওয়া যেত। গ্রামের গরীবি দূর করা যেত। এই প্রয়াসে কি বাধা আছে?

ভারতের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় গোপনীয়তা হল অর্থ ব্যবস্থার অন্যতম দোষ-ত্রুটি। ভারতের তো এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা উচিত। অথচ এর বিরুদ্ধে — অর্থ ব্যবস্থার গোপনীয়তা আইনদ্বারা সুরক্ষিত। কিন্তু এই গোপনীয়তা-ই হল বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কাছে সবচেয়ে বড় অন্তরায়। সবার আগে জার্মানি, এরপর ফ্রান্স, আমেরিকা এবং এখন ইংল্যাণ্ড আলাদা আলাদা বা একসঙ্গে মিলে গোপন ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। 'ট্যাক্স হেভেন' অর্থাৎ কর প্রবঞ্চ কদের স্বর্গরাজ্য এই দেশে অনাবাসীদের গচ্ছিত ধনের ওপর না দিতে হয় আয়কর, না অর্থের উৎসের কৈফিয়ৎ। আধুনিক পুঁজিবাদ গোপনীয় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাকে এতদিন উপেক্ষা করেছে। এখন পশ্চিমী দেশগুলির লক্ষ্য আল কায়দারও গোপন অর্থ এখানে গচ্ছিত রয়েছে কি না?

এমন পরিবর্তন হঠাৎ কেন হল? এর সংক্ষিপ্ত উত্তর হল আর্থিক সঙ্কট। বৃটিশ সংবাদপত্র 'গার্ডিয়ান' গত মাসে লিখেছে যে, ইউরোপের নেতারা বেজায় চিন্তিত এই জন্য যে, 'ট্যাক্স হেভেন' গোপনীয়তাকে উৎসাহিত করছে এবং বিশ্বজুড়ে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাকে প্রতিহত করছে। সুইস ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে ২০০৮ সালে জার্মানী জেহাদ তখন শুরু করল, যখন সে দেশের তদন্তকারী সংস্থাকে ঘুষকাণ্ড তদন্ত করতে ঘুষ দিতে হয়েছিল। লীয়টেস্টাইন স্থিত এল জি টি ব্যাঙ্কের এক গোয়েন্দা উৎকোচ নিয়ে এক সিডি হস্তান্তর করে, যেখানে প্রায় দেড়হাজার কর প্রবঞ্চ কদের নাম ছিল। এর মধ্যে অর্ধেক ছিল জার্মানী, যাদের দপ্তরে তদন্ত চালানো হয়। অন্যান্য দেশের নাগরিকদের মধ্যে যাদের এই সিডি-তে নাম ছিল, জার্মানি তা বিনামূল্যে সেইসব দেশকে দিয়েছে। এর ওপর ভিত্তি করে সংশ্লিষ্ট দেশগুলি কর ফাঁকি দেয় এমন লোকজনদের নামও জেনেছে। এরপর ২০০৮ সালের তৃতীয় অংশে জার্মানি আর্থিক সহযোগ ও বিকাশ সংগঠন চাপ বৃদ্ধি করে সতর্ক করে দেয় যে, করপ্রবঞ্চ কদের বাঁচানোর চেষ্টা করলে সুইজারল্যান্ডকে কালো তালিকাভুক্ত করবে।

আমেরিকার ধমকী ছিল আরও জোরদার। ১৮ ফেব্রুয়ারিতে আমেরিকার অভ্যন্তরীণ রাজস্ব বিভাগ সর্ববৃহৎ সুইস ব্যাঙ্ক ইউ বি এস-কে ধমকী দেয় যে কথা না শুনলে মামলা করা হবে। আমেরিকায় বক্তব্য ছিল যে, সুইস ব্যাঙ্ক যদি সে দেশের তিনশো আমেরিকান করপ্রবঞ্চ কদের নাম ঘোষণা না করে তো মামলা দায়ের করে ব্যাঙ্ককে দেউলিয়া করে দেবার ব্যবস্থা করবে। ভয় পেয়ে সুইস ব্যাঙ্ক ইউ বি এস আদালতের সমন পেয়েই আমেরিকার সব গোপন তথ্য প্রকাশ করে দেয়। এইসব ঘটনা প্রবাহে ঘাবড়ে গিয়ে ১৪ মার্চ বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী গর্ডন ব্রাউনের সঙ্গে সুইস বিত্তমন্ত্রী সাক্ষাৎ করেন — যাতে জি-২০ সম্মেলনে তাঁর দেশকে কালো তালিকাভুক্ত করতে চেষ্টা না করা হয়। সমঝোতার মধ্য দিয়ে সুইস ব্যাঙ্ক আই সি ডি-কে ব্যাঙ্ক পারদর্শিতায় উপদেশ দেওয়া হয়। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ব্রাউনের দাবির মাধ্যমে ব্যাঙ্ক গোপনীয়তা বন্ধের শুরু। আমেরিকা তো আরেক কদম এগিয়ে — ব্যাঙ্ক গোপনীয়তাকে দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য করার প্রস্তাব দেয়।

পশ্চিমী দেশ যখন এর বিরুদ্ধে অভিযানে সফল, তখন মনমোহন সরকার এই প্রয়াসকে স্বাগত না জানিয়ে বরং এই বিষয়ে চিন্তিত। এর পশ্চাতে তিনটি প্রমাণ আছে। প্রথমত জার্মানির বিত্ত মন্ত্রালয় যখন বিভিন্ন তথ্য আদান-প্রদানের প্রস্তাব দেয়, তখন মনমোহন সরকার গড়িমসি করল। ওই তালিকায় প্রায় একশো ভারতীয়ের নাম রয়েছে। গত বছর যখন আদবানীজী চিঠি লিখে জার্মানি থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে বলেন, তখন অর্থমন্ত্রী কোনও উদ্যোগ নিলেন না। এতে পরিষ্কার যে, সরকারের এসব বিষয়ে কোনও আগ্রহ নেই।

দ্বিতীয়ত, জার্মানির বার্লিনে জি-২০ বৈঠকে যখন জার্মান-ফ্রান্স সুইসসহ অন্য 'ট্যাক্স হেভেন' দেশগুলিকে কালো তালিকাভুক্ত করার ধমকি দেয় তখন ভারত চুপচাপ। ভারত যখন ব্যাঙ্কিং গোপনীয়তা সমস্যায় জড়িত তখন এই বিষয়ে ভারতেরই উচিত নেতৃত্ব দেওয়া। জেহাদ ঘোষণা তো দূর, ভারতে এই বিষয়ে যারা জেহাদি তাদেরও নৈতিক সমর্থন করে না। সম্প্রতি আদবানীজী যখন প্রধানমন্ত্রী মনমোহনকে বলেন জি-২০ সম্মেলনে ব্যাঙ্কিং গোপনীয়তার বিরুদ্ধে সামিল হতে তখন প্রধানমন্ত্রী কোনওরকম প্রতিক্রিয়া জানাননি। কংগ্রেস প্রবক্তা অভিষেক মনু সিংভি উল্টে বলেন, জি-২০ মঞ্চ এই বিষয়ে উপযুক্ত নয়। জি-২০ তে এই বিষয় মুখ্য আলোচ্য বিষয়ে ঠাঁই পেলেও ভারত না বোঝার ভান করে থাকে।

ডঃ সিংহের বাধ্যবাধকতা বোঝা মুশকিল। ১৯৮৭-তে ক্ষমতাধর যে পরিবার যে সংশয়ে বিদেশে গুপ্তধন উন্মোচন তদন্তে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছিল আজও তা বহাল। বিদেশে গচ্ছিত কালাধন বিষয়টা ভোটের প্রচারে সামিল করায় আদবানীর ঘোষণা মনমোহনের কপালে আরও ভাঁজ ফেলে দিল। এখন ডঃ সিংহ চুপ হয়ে থাকতে পারবেন না। কমপক্ষে কিছু করে তো দেখাতে হবে। কিন্তু উনি কি তা করে দেখাতে পারবেন? মনমোহনের একদিকে কুয়ো, অন্যদিকে খাদ।

[লেখক একজন প্রতিষ্ঠিত অর্থনীতিবিদ]

কালো টাকার পর্দা ফাঁসে আদালতে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। বিদেশে গচ্ছিত টাকাকে দেশে ফেরাতে সচেষ্ট হয়েছে বিজেপি। দেশের আর্থিক উন্নয়ণের দিকে তাকিয়েই এই ইস্যুকে হাতিয়ার বানাচ্ছে দল। এই কালো টাকা দেশে ফিরিয়ে আনতে ইউ পি-এ সরকারকে আরও সক্রিয় হতে বাধ্য করার জন্য দল ইতিমধ্যেই সর্বোচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে। কর ফাঁকি দিয়ে বিদেশের ব্যাঙ্কগুলিতে গোপনে রাখা এই টাকার পরিমাণ ৭০ লক্ষ কোটি টাকা বলে অনুমান করা হচ্ছে। এই বিষয়ে মনমোহন সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করার জন্য বিজেপি সর্বোচ্চ আদালতে পিটিশন দায়ের করেছে। বিজেপি-র প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিশিষ্ট আইনজীবী রাম জেঠমালানির নেতৃত্বে বিজেপি আদালতে মামলা দায়ের করেছে। বিজেপির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের প্রধান বিচারপতি কে জি বালাকৃষ্ণণের নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ বিষয়টির আরও খুঁটিনাটি দলকে জানাতে বলেছে। এই বিষয়ে কোর্টে খুব শীঘ্রই শুনানি হবে বলে জানিয়েছেন বেঞ্চে র সিনিয়র কাউন্সিল অনিল ধাওয়ান।

কয়েকদিন আগেই এন ডি এ-র প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী লালকৃষ্ণ আদবানী বিষয়টি জনসমক্ষে আনেন। তিনি এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কঠোর সমালোচনাও করেন। এই টাকার সিংহভাগ দেশের উন্নয়ণের কাজে লাগানো যেতে পারে বলেও তিনি তাঁর বক্তব্যে জানান। এন ডি এ ক্ষমতায় ফিরলে গচ্ছিত টাকা দেশে ফিরিয়ে আনার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

বিজেপি কোর্টে দাখিল করা পিটিশনেও বিদেশের ব্যাঙ্কে পড়ে থাকা টাকা দেশের উন্নয়ণে কাজে লাগানো যাবে বলে জানিয়েছে। প্রায় ৭০ লক্ষ কোটি টাকা গচ্ছিত রয়েছে বলে ওই আবেদন পত্রে জানানো হয়েছে। সেই সঙ্গে দল সর্বোচ্চ আদালতের কাছে ইউ বি এস, সুইস প্রভৃতি ব্যাঙ্কের গচ্ছিত কালো টাকার পিছনে জড়িয়ে থাকা নেতা ও অন্যান্য ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ারও আবেদন জানিয়েছে। দেশের অর্থনীতিবিদদের একাংশের মতে এই কালো টাকার পিছনে বড় চক্র রয়েছে। যার মধ্যে ক্ষমতাসীন দলের নেতা বা বড় ব্যক্তিদের যোগসাজস থাকা আশ্চর্যের কিছু নয়। নির্বাচনের আগে এই ধরনের ইস্যু তুলে ধরায় বিপাকে পড়েছে কংগ্রেস। মনমোহন সিং-এর মতো অর্থনীতিবিদ যেখানে প্রধানমন্ত্রী, যেখানে সুইজারল্যান্ডের জমে থাকা এই কালো টাকার চক্র নির্বাচনে প্রভাব ফেলতে পারে — এমনই আশঙ্কা অর্থনীতিবিদদের একাংশেরও।

সুইস ব্যাঙ্কে বেআইনীভাবে গচ্ছিত টাকা ফেরৎ আনতে কংগ্রেস সরকারের এত অনীহা কেন ?

এন সি দে

সম্প্রতি সুইস ব্যাঙ্কিং অ্যাসোসিয়েশন তাদের ব্যাঙ্কে গচ্ছিত অর্থের যে হিসাব পেশ করেছে, তাতে যেকোনও ভারতীয়র মাথার চুল খাড়া হয়ে যেতে বাধ্য। এই হিসেব থেকে দেখা যাচ্ছে ভারতীয়দেরই আছে ১,৪৫৬ বিলিয়ন ডলার, ইংল্যান্ডের আছে ৩৯০ বিলিয়ন ডলার, রাশিয়ার আছে ৪৭০ বিলিয়ন ডলার, ইউক্রেনের আছে ১০০ বিলিয়ন ডলার আর চীনের আছে ৯৬ বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ৪টি দেশের মিলিত টাকার চেয়েও বেশি অর্থ আছে ভারতীয়দের। ভারতকে তাই ব্যঙ্গ করে বলা হয় "ভারত একটি দরিদ্র অধ্যুষিত ধনী দেশ"। বিখ্যাত লেখক দয়াকৃষ্ণণ তাই সঠিক ভাবেই বলেছেন, "ভারতের দরিদ্র পরিকল্পিত"। তা না হলে বিশ্বের ধনী ব্যক্তিদের নামের তালিকায় প্রথম দিকে ভারতীয়দেরই নাম থাকবে কেন ?

সে যাই হোক, এই যে বিপুল অর্থ অন্য দেশে গচ্ছিত রয়েছে এর জন্য তো সুইস ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ আমানতকারীকে কোনও সুদ দিচ্ছে না। উপরন্তু নিজেদের দেশে এবং অন্যান্য দেশে শিল্পে, কৃষিতে বা অন্যান্য আর্থিক বিকাশে এই অর্থ বিনিয়োগ করছে — উচ্চ সুদে অর্থাৎ নিজ দেশের অর্থই হয় তো এদেশে ঢুকছে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ বা বিদেশী কোম্পানীর বিনিয়োগ হিসাবে। এই বিপুল পরিমাণ কালো টাকা দেশের বাইরে যায় মূলতঃ Participatory notes Ý FII-র মাধ্যমে। সরকার Capital Gains Tax তুলে দেওয়ায় দেশে ফিরলেও কোনও ট্যাক্স দেয় না। অথচ কালো টাকা সাদা হয়ে যায়। সুইস ব্যাঙ্কে কোনও সুদ না মিললেও দেশের মধ্যে অর্জিত এই বিপুল পরিমাণ অর্থ তো ন্যায়সঙ্গ তভাবে অর্জিত নয়। এর জন্য কোনও ট্যাক্সও দেওয়া হয়নি, যেহেতু এই অর্থ বেআইনীভাবে অর্জিত এবং হিসাব বহির্ভূত।

এবার দেখা যাক এই অর্থ যদি দেশে ফিরে আসত তাহলে দেশের কি কি লাভ হত ? যদি নাম-ধাম প্রকাশিত হত তাহলে আমাদের রাজনৈতিক নেতা, বর্তমান ও প্রাক্তন মন্ত্রীগণ (বাম ও অবাম) কেন বছরে দু-বার করে শিল্পপতি ধরে আনতে বিদেশে যেতেন তা জানা যেত। দ্বিতীয়ত, দেশের বিদেশী ঋণ মিটিয়ে দেওয়া যেত। কারণ হিসেব করে দেখা গেছে এই ব্যাঙ্কে যে টাকা গচ্ছিত আছে তাহল আমাদের বিদেশী ঋণের ১৩ গুণ বেশি। ৪৫ কোটি গরীব মানুষকে প্রত্যেককে ১ লাখ করে টাকা দেওয়া যেত। বিদেশী ঋণ মিটিয়ে দেওয়ার পরও বিপুল অর্থ হাতে থাকত এবং এই উদ্বৃত্ত অর্থ যদি জমা রাখা যেত তাহলে তা থেকে প্রাপ্ত সুদের পরিমাণ বাৎসরিক কেন্দ্রীয় বাজেটের খরচের চেয়েও বেশি হতো। স্বভাবতই বাড়তি অর্থ দিয়ে আমাদের দেশের শিল্প, কৃষিসহ সমস্ত ক্ষেত্রের পরিকাঠামো গড়ে তোলা যেত। দেশের প্রায় ৭ লক্ষ গ্রামের পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য প্রতিটি গ্রামকে ১ কোটি টাকা দেওয়া যেত।

মনে রাখতে হবে এই টাকার পরিমাণও কিন্তু সঠিক নয়। কারণ গ্লোবাল ফাইনান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি স্টাডিজ এই তথ্য দিয়েছে ২০০৬ সালে। এই স্টাডিজের মতেই এই টাকার পরিমাণ ১৮.২ শতাংশ চক্রবৃদ্ধি হারে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। ২০০৬ সালের দেওয়া তথ্যও যদি সঠিক হয় তাহলেও ২০০৯ সালে এই অর্থের পরিমাণ কত তা সহজেই অনুমান করা যায়। দ্বিতীয়ত, সুইস ব্যাঙ্ক ছাড়াও আরও অনেক ব্যাঙ্কেও বিপুল কালো টাকা গচ্ছিত আছে — জয়ললিতা যার পরিমাণ অনুমান করা হচ্ছে ৭০ থেকে ৭৫ লক্ষ কোটি টাকা।

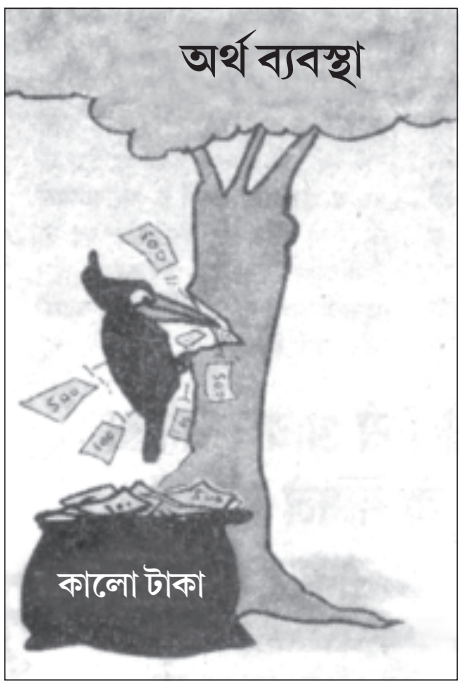

আমেরিকা যদি নিদারুণ আর্থিক সঙ্কটে না পড়ত, এবং সুইস ব্যাঙ্ককে হুঙ্কার না দিত তাহলে এই ইস্যুটি কেউ তুলতেই সাহস করত না। ভারতবর্ষে বিজেপি বাদে কোনও দলই এই অর্থ ফেরৎ আনার দাবি জানায়নি। বিজেপি'র প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী লালকৃষ্ণ আদবানী প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর কাছে দাবি জানিয়েছিলেন যাতে তিনি জি-২০ ভুক্ত দেশগুলির বৈঠকে এই দাবি জানান। দুঃখের কথা তিনি ওই বৈঠকে দ্ব্যর্থহীনভাবে দৃঢ়তার সঙ্গে ওই দাবি জানাননি। এমনকী জার্মান সরকার বলা সত্ত্বেও যে তাদের কাছে আমানতকারীদের নামের তালিকা আছে যা তারা আদায় করেছে নিজেদের জোরে, তা তারা ভারত সরকারকে দিতে পারে।

অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা যে উভয় ব্যাপারেই কংগ্রেস সরকার শুধু হাত গুটিয়েই বসে নেই, তারা ভোটের বাজারে নানান কু-যুক্তি দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করছে। কখনও বলছে আদবানীর হিসেব ঠিক নেই। অথচ এই হিসাব কিন্তু Global Financial Studies-এর দেওয়া। আদবানীর কথা মনগড়া নয়। আর এই হিসাবটি জার্মান সরকারের কাজ থেকে নিলেই তো হয়। আবার কখনও বলছে জি-২০ বৈঠকে এই ইস্যু তোলা যায় না। তাহলে ২রা এপ্রিল '০৯-এ এই গোষ্ঠীর যৌথ বিবৃতিতে কি করে বলা হয় যে তাদের আর্থিক ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে তারা অসহযোগিতার ক্ষেত্রগুলির বিরুদ্ধে বিশেষ করে করদাতাদের স্বর্গভূমি (সুইজারল্যান্ডের) বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণ করার শপথ নিচ্ছে। আমাদের জনগণের অর্থ ও জনগণের অর্থ ব্যবস্থাকে রক্ষা করতে যে কোনও ধরনের নিষেধাজ্ঞা জারি করতেও আমরা প্রস্তুত। ব্যাঙ্ক ব্যবস্থায় গোপনীয়তার যুগ শেষ। আমরা এটাও জানাতে চাই যে অর্গানাইজেশন ফর ইকনমিক কো-অপারেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট (OECD) একটি তালিকা প্রকাশ করেছে যাতে একটি গ্লোবাল ফোরাম অনেক দেশের তথ্য সঙ্কলিত করেছে যারা ট্যাক্স সম্পর্কিত তথ্য বিনিময়ে আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড লঙ্ঘন করেছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তিনি প্রকৃতপক্ষেই ইস্যুটি জোরের সঙ্গে তো তোলেনইনি। বরং জানা গেছে অর্থ মন্ত্রকের এক সিনিয়র অফিসার জার্মানিতে ভারতের রাষ্ট্রদূতকে এক পত্র লিখে আদেশ দেন যাতে জার্মানদের ভারতীয়দের নামের তালিকা প্রকাশ করতে কোনওরকম চাপ দেওয়া না হয়।

এখন বলা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী রাতের খাওয়ার টেবিলে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া ভোজসভায় নাম কা ওয়াস্তে ইস্যুটি হালকাভাবে তুলেছিলেন।

ব্যাপারটি চাপা দিতে কংগ্রেস মুখপাত্র জয়রাম রমেশ কখনও বলছেন, এমন কী পরিমাণ টাকা ওখানে আছে যে আদবানী এত লাফালাফি করছে, আবার কখনও বলছেন, আদবানীরা যখন ক্ষমতায় ছিল তখন তারা কি করছিল ইত্যাদি ইত্যাদি। এসবই হচ্ছে ভারতীয় রাজনীতির তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ মুসলিম তোষণকারী নেতাদের আড়াল করার প্রক্রিয়া। ভোটদাতাদের উচিৎ রাষ্ট্রের স্বার্থে কংগ্রেসসহ তাদের পূর্বতন সরকারি দোসরদের উপর চাপ সৃষ্টি করা।

মানব সম্পদ উন্নয়ণের লক্ষ্যে সূর্য ফাউণ্ডেশনের ব্যক্তিত্ব বিকাশ বর্গ

দীপক গঙ্গোপাধ্যায় ।। দেশের মানব সম্পদ উন্নয়ণের লক্ষ্যে দেশব্যাপী 'ব্যক্তিত্ব বিকাশ শিবির'-এর মাধ্যমে এক বড়সড় উদ্যোগ নিতে চলেছে সূর্য ফাউন্ডেশন। সংস্থার সূত্র অনুসারে ভারতের কুড়িটি রাজ্যের চল্লিশ হাজার তরুণ-এর মধ্যে সততা, নেতৃত্ব, দেশপ্রেম ইত্যাদি গুণগুলি বিকাশের লক্ষ্যে এই শিবির সঞ্চালিত হবে।

প্রসঙ্গত সূর্য ফাউন্ডেশন দেশে এক পরিচিত নাম। দীর্ঘদিন ধরেই সমাজের সর্বস্তর থেকে সব ধরনের বালক, তরুণদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের উপযোগী করে তোলার কাজ সাফল্যের সঙ্গে করে আসছে। এবার আরও বিস্তৃতভাবে এবং আরও বড় লক্ষ্য নিয়ে এই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে সংস্থার কর্ণধার জয়প্রকাশ আগরওয়াল এক বিবৃতিতে জানান।

উত্তরে লাদাখ থেকে পূর্বের অরুণাচল প্রদেশ, দক্ষিণে কেরল থেকে উত্তরে দিল্লী, এমনকী দেশের সবচাইতে অর্থনৈতিক অনগ্রসর কালাহান্ডি থেকে সমৃদ্ধ মুম্বাই পর্যন্ত তরুণ যুবকরা একসঙ্গে প্রশিক্ষণ পাবে। প্রশিক্ষণের বিষয় বস্তুত মানবসম্পদ উন্নয়ণের পাশাপাশি জাতীয় স্বার্থে সুপ্রয়োগের দিকে নজর দিয়ে ঠিক করা হয়েছে। এই প্রশিক্ষণ যেমন দৈনন্দিন পড়াশুনায় মানোন্নয়ণের ক্ষেত্রে কাজে লাগবে বলে প্রশিক্ষকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তুর মধ্যে শারীরিক উৎকর্ষতার বিষয় যেমন থাকবে তেমনি দলগত খেলাধূলা, এবং বুদ্ধি বিকাশের সহায়ক খেলাধূলায়ও থাকবে। অন্যদিকে ছোট ছোট গল্পের মাধ্যমে নীতি শিক্ষা, রাষ্ট্রবোধ তথা দেশপ্রেম এবং আধুনিক ম্যানেজমেন্টের বিষয়গুলিও যাতে রপ্ত করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে বিষয়বস্তু ঠিক করা হচ্ছে। তাছাড়াও পরিবেশ সচেতনতা, ঝড়, বন্যা, মহামারী, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি প্রাকৃতিক বা মানবকৃত দুর্যোগে সেবাকাজ চালানোর মতো দক্ষতা বৃদ্ধি র দিকেও জোর দেওয়া হবে। আর এই সমস্ত কিছুর পিছনে তরুণ ও যুবকদের যাতে আত্মবিশ্বাস বাড়ে, তার দিকেও নজর রেখে প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু ঠিক করা হয়েছে বলে প্রশিক্ষকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়।

আত্মনিয়ন্ত্রণ, সংযম এবং উদ্যামী করে তোলার জন্য যোগ, ধ্যান, প্রাণায়ামও এই প্রশিক্ষণ বর্গের অন্যান্য দিক। এই সমস্ত কিছুর মাধ্যমে মানব সম্পদের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি এবং তার যথাযথ প্রয়োগের প্রতিও নজর দেওয়া হয়েছে বলে সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়।

মতুয়া ধর্ম

হিন্দুধর্ম থেকে সৃষ্ট মতুয়া-ধর্ম প্রকৃতপক্ষেই একটি ভারতীয় ধর্ম। এই ধর্মের রয়েছে সুনির্দিষ্ট একটি মত ও পথ। মূলত বাংলার নমঃশূদ্র সম্প্রদায় এই ধর্মের ও মত-পথের অনুগামী হলেও নিম্নবর্গীয় কোনও কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই ধর্মের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। উচ্চবর্ণেরও কেউ কেউ এই ধর্মের নির্দেশিত মত ও পথের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। মতুয়া ধর্মের বাণী তাই হিন্দু ধর্মেরও বাণী।

মতুয়া ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হরিচাঁদ ঠাকুর। তিনি ১৮১২ সালে বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার ওড়াকান্দি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সেই সময়ে বাংলার হিন্দু সমাজ ছিল মারাত্মক জাতিভেদ, বর্ণবৈষম্য ও অস্পৃশ্যতার মারণব্যাধিতে জর্জরিত। স্বভাবত নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের অবহেলিত মানুষজন হন সেই ব্যাধির সবচেয়ে বেশি শিকার। সমাজের এই অনৈতিক ভেদাভেদ ও বৈষম্য ঠাকুর হরিচাঁদকে করে ভীষণভাবে পীড়িত ও ব্যথিত। তবু হিন্দুধর্মের মধ্যে থেকেই নিজ সম্প্রদায়ের মানুষদের জন্য প্রবর্তন করেন 'মতুয়া ধর্ম। এই ধর্মের পীঠস্থান বাংলাদেশের ওড়াকান্দি হলেও তার বর্তমান ঠিকানা এরাজ্যের ঠাকুরনগর। দেশভাগের পর ওড়াকান্দি পূর্ব-পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় হরিচাঁদ ঠাকুরের প্রপৌত্র প্রমথরঞ্জন ঠাকুর সপরিবারে ভারতে চলে এসে ঠাকুরনগরে প্রতিষ্ঠা করেন ঠাকুরবাড়ি। বর্তমানে এখানেই বসে মেলা, চলে বারুণির স্নান ও মহোৎসব।

এখন প্রশ্ন, মতুয়া মহোৎসব ওড়াকান্দির বদলে কেন ঠাকুরনগরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে? কেন ওড়াকান্দিতে উৎসব পালিত হচ্ছে প্রায় নীরবে — নমো নমো করে, আর ঠাকুরনগরে তা পালিত হচ্ছে মহাসমারোহে লক্ষ লক্ষ ভক্তের ভীড়ে? উত্তর একটাই — ওড়াকান্দি আজ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ইসলামিক দেশের অন্তর্ভুক্ত। আর ইসলামিক দেশে সংখ্যালঘু অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা যে নিরাপদ নয় তাঁর জ্বলন্ত প্রমাণ — দেশভাগের পর জান ও মান বাঁচাতে লক্ষ লক্ষ হিন্দুর পাকিস্তান ত্যাগ। বর্তমান বাংলাদেশ থেকে ওই একই কারণে হিন্দুদের দেশত্যাগ আজও অব্যাহত। গন্তব্যস্থল হিন্দুগরিষ্ঠ ভারত। কিন্তু ভারত বিশেষত পশ্চিমবঙ্গ ক্রমশ যেভাবে মুসলিম গরিষ্ঠতার পথে এগিয়ে চলছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে ঠাকুরনগরে সাড়ম্বরে মতুয়া উৎসব পালিত হতে পারবে কী? আর দেশটাই ইসলামিক রাষ্ট্রে পরিণত হলে ঠাকুরনগর বর্তমান 'ওড়াকান্দি' হয়ে যাবে না কী? অনেকে হয়তো বলবেন — এটা অলীক কল্পনা, বাস্তবতার পরিপন্থী। কিন্তু তাঁদের মনে রাখা উচিত, কল্পনার গর্ভেই বাস্তবের সৃষ্টি।

এ সম্পর্কে একটা ছোট্ট উদাহরণ দিচ্ছি। নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের তদানীন্তন নেতা যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল পাকিস্তান দাবিকে সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেও সপরিবারে দেশত্যাগ করে আসতে বাধ্য হন 'বর্ণ হিন্দুদের ভারতে' এবং এদেশেই ঘটে তাঁর গঙ্গাপ্রাপ্তি।

এটাই কিন্তু ফলিত ইতিহাস, এটাই রূঢ় বাস্তব। আর এই বাস্তবের মুখোমুখি আজ আমরাও। আজ আমরা এদেশেও শুনতে পাচ্ছি ইসলামের জয়ধ্বনি, প্রত্যক্ষ করছি মুসলিম তোষণের দৌড় প্রতিযোগিতা। এই ভোটের মরশুমে সেকুলারবাদী (মুসলিম তোষণকারী) নেতা-নেত্রীদের দেখছি ক্ষমতার লোভে একদিকে মতুয়াদের মন জয় করতে, অন্যদিকে মুসলিমদের তুষ্টিকরণে ব্রতী হতে। তাঁরা ঠাকুরবাড়ির উন্নয়ণে কেউ দান করছেন এম পি ল্যাডের টাকা, কেউ দান করছেন অর্থদানের প্রতিশ্রুতি, আর কেউ বা হচ্ছেন ভক্তিতে গদগদ। তাঁরাই আবার মুসলিম মেহফিলে উপস্থিত হয়ে এ রাজ্যকে মাদ্রাসা-মসজিদে ভরে দেওয়ার দিচ্ছেন প্রতিশ্রুতি। তাঁরা ভোটের স্বার্থে শ্যাম-কুল দুই-ই রাখছেন। আর কে না জানে যে অধিকাংশ মাদ্রাসাই হচ্ছে হিন্দু বিদ্বেষী, ভারত বিরোধী, বিচ্ছিন্নতাবাদী তথা ইসলামিক জঙ্গি সৃষ্টির কারখানা। অথচ এই নেতা-নেত্রীরা কানে তুলো গুঁজে, চোখে ঠুলি পরে মাদ্রাসা নির্মাণের দাবি মেনে নিচ্ছেন। এ যেন বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি। এদেশকে ইসলামিক রাষ্ট্রে পরিণত করার ফাঁদে পা ফেলা। ক্ষমতার রাজনীতি তাঁদেরকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করে দিয়েছে।

তাই মতুয়া ধর্মাবলম্বীদের কাছে নিবেদন, আপনারা ইতিহাসকে ভুলে না গিয়ে, বিবেককে বন্ধক না দিয়ে এবং কঠিন বাস্তবকে স্বীকার করে এমন দলের প্রার্থীকে ভোট দিন যে দল হিন্দুদের স্বার্থ রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মনে রাখতে হবে, হিন্দু বাঁচলে ভারত বাঁচবে, হিন্দুধর্ম বাঁচলে মতুয়া ধর্মও বাঁচবে। অতএব, সাধু সাবধান!

পরিশেষে, ঠাকুর হরিচাঁদের চরণে প্রণাম জানাই।

ধীরেন দেবনাথ, কল্যাণী, নদীয়া।

চিঠিপত্র

বাংলা ভাগের জন্য কুম্ভীরাশ্রু

যারা বলে বাংলা ভাগে মদত দিচ্ছে বিজেপি, সেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ছিল মুসলিম লীগের ভারত ভাগ করে পাকিস্তান দাবির সমর্থক। তারা ওই দাবির সমর্থনে মুসলিম লীগের সঙ্গে মিটিং মিছিলও করেছিল। ১৯৪৬-এর ১৬ আগস্ট মনুমেন্টের নীচে দাঙ্গার উদ্বোধনী সভায় জ্যোতি বসু সশরীরে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তখন ছিলেন সুরাবর্দির সহযোগী।

সেই সময় উপমহাদেশ জুড়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রক্তবন্যা বইয়ে পাকিস্তান করা হয়েছিল, সুরাবর্দি নেই জিন্নাও নেই। কিন্তু জ্যোতি বসু আজও বেঁচে আছেন। ভারত ভাগ করে পাকিস্তানের জন্য আন্দোলন এবং ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান সৃষ্টি যে অন্যায় বা ভুল হয়েছিল একথা জ্যোতি বসু এবং তার পার্টি আজ পর্যন্ত একটিবারের জন্যও স্বীকার করেননি।

ধর্মনিরপেক্ষতার ধবজাধারী কমরেডরা দেশভাগ ও ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান গঠনের দাবি জানিয়েছিল। মুসলিম লিগ ও কমিউনিস্টদের যৌথ আন্দোলন ও কংগ্রেসের সহযোগিতার ফল একথা আজও আমরা ভুলতে পারিনি।

গত ৩২ বছর ধরে দার্জিলিং পাহাড়কে বঞ্চিত করে কোনও পরিষেবা- পরিকাঠামো না দিয়ে পাহাড়বাসীকে কার্যত শোষণ করে চলেছে বামফ্রন্ট সরকার। এতদিন পাহাড়ে কংগ্রেসকে জিতিয়ে দেওয়ার পেছনেও ছিল সিপিএমের রাজনৈতিক অভিসন্ধি।

দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার অনুরোধে এবার প্রার্থী হয়েছেন বিজেপির বরিষ্ঠ নেতা যশোবন্ত সিংহ। বিজেপি একবারও স্বতন্ত্র গোর্খাল্যান্ড রাজ্য দাবীর যৌক্তিকতা নিয়ে একটি শব্দও উচ্চারণ করেনি। যশোবন্ত সিংহ বলেছেন, তিনি গোর্খা, জনজাতি বনবাসী, বিভিন্ন জনজাতির ৩২ বছরের বঞ্চনা ও শোষণের প্রশ্নটি সহানুভূতির সাথে জাতীয় পর্যায়ের রাজনীতিতে তুলে ধরবেন।

ভুললে চলবে না আজকের বাংলায় বুদ্ধ-অশোক ভট্টাচার্যরা রাজত্ব করতে পারছেন কারণ বিজেপির পূর্বসূরী জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী পাকিস্তান ভাগ করে আজকের বাংলাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। তাই কমরেড, আপনারা বিজেপি সম্পর্কে বাংলা ভাগের মিথ্যা প্রচার করতে পারছেন।

আজ দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। এর চার পাশে বাংলাদেশ, নেপাল, ভূটান। কাছেই রয়েছে চীন সীমান্ত। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে খবর দার্জিলিং অঞ্চলে একের পর এক বৌদ্ধ মঠ গড়ে উঠছে চীনের মদতে। গোয়েন্দারা মনে করছেন এই সব বিশাল বৌদ্ধ মঠ থেকে চীন চরবৃত্তি করছে।

প্রতিরক্ষার দিক দিয়ে এই অঞ্চল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই পথটুকু কেটে দিতে পারলে উত্তর পূর্বাঞ্চলকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা যাবে। এই অঞ্চলের রাজ্যগুলো জুড়ে যে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলি সক্রিয় তাদের পেছনে আই এস আই এবং চীনের হাত আছে।

এই চীনকে মদত দিচ্ছে সিপিএম। নির্বাচনের মুখে সিপিএম খোলাখুলি জানিয়েছে, চীনের প্রতি তাদের আনুগত্য আজও অটুট। ১৯৬২ সালে চীন ভারত আক্রমণ করলে এই দেশের যে রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীরা ভারতের বিরুদ্ধে চীনকে সমর্থন করেছিলেন তারাই গড়েছে সিপিএম। ২০০৯ সালে সিপিএম কেন্দ্রীয় কমিটি প্রচারিত নির্বাচনী পুস্তিকায় বলা হয়েছে চীনের পথে ভারতকে নিয়ে যেতে হবে।

মাওবাদীরা নেপালকে দখল করে নিয়েছে। সীতারাম ইয়েচুরির বন্ধু মিশনারী খৃস্টান প্রচণ্ড বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় নেপাল আজ ভারত বিরোধী একটা কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

সিপিএম বাংলার লালগড়সহ কোথাও জনজাতি গোষ্ঠীর উপকার করতে পারেনি, কেবল শোষণ করে পার্টি-কমরেডদের বড়লোক বানিয়েছে।

কিন্তু বিজেপির জন আন্দোলনের ফলে ঝাড়খণ্ড, ছত্তিসগড়, উত্তরাখণ্ড এইসব জনজাতি এসসি/এসটি মানুষেরা মাথা তুলে আত্মমর্যাদার সঙ্গে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বিজেপি অখণ্ড ভারতে বিশ্বাস করে, বিচ্ছিন্নতাবাদে বিশ্বাস করে না। বাংলা ভাগের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। গোর্খাদের জনজাতি (এসসি/এসটি) সমাজের বিভিন্ন দাবি দাওয়া ও আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতিশীল একটি জাতীয় দল তাঁদের জাতীয় রাজনীতির মূল স্রোতে টেনে আনতে পারে তবে বাংলার মঙ্গল, ভারতেরও মঙ্গল, তাই দার্জিলিং কেন্দ্রে যশবন্ত সিং বিজয়ী হলে বাংলার কল্যাণ, ভারতের কল্যাণ।

অজিত কুমার বিশ্বাস, পূর্বাশা, কলকাতা-৫৪

অলীক কল্পনা

পরমাণু চুক্তির বাহানা দেখিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে সমস্ত রকমের সুযোগ সুবিধা নিয়ে একেবারে শেষ মুহূর্তে সরকার থেকে সমর্থন তুলে নিয়ে, ঝরাত এন্ড কোম্পানী এখন তৃতীয় ফ্রন্টের স্বপ্নে বিভোর।

নিজেদের অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখতেই তাদের যে এই তৃতীয় ফ্রন্টের তোড়জোড় সেটা বুঝতে আর বেশি বুদ্ধি খরচ করবার দরকার হয় না। এখন প্রকাশ কারাত এবং সীতারাম ইয়েচুরির বিভিন্ন সুবিধাবাদী দলের কাছে কাতর আর্জি জানাচ্ছেন এই তৃতীয় ফ্রন্টে যোগ দেবার জন্য। কারণ ভারতীয় রাজনীতিতে কোনও রূপ ত্যাগ স্বীকার না করে, মোটা মাইনের চাকরিটা এবং গ্ল্যামার হারাবার ভয়ে এই দুজন এখন দিশেহারা। এদের ঘোর দুর্দিনে মগজ খেলাচ্ছেন, মারাঠার রাজা শারদ পাওয়ার আর দলিতের মসিহা বহেন মায়াবতী। যারা নিজেরাই যে কোনও মূল্যে প্রধানমন্ত্রীর কুর্সিতেবসবার জন্য মরিয়া। একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, কোনও দলকে পরিচালনা করার জন্য দরকার, একদল সফল কান্ডারীর যার নির্দেশ সকলে মেনে চলবেন। সেটা কি এদের আছে। এদের এমনই দুরবস্থা যে দল জিতলে প্রধানমন্ত্রী কে হবেন, তা বলতে পারছেন না। এদের না আছে কোনও সুষ্ঠু নীতি বা পরিকল্পনা। যদিও সেই আশা দূর অস্ত কিন্তু দেশের জনগণ এদের কেন্দ্রীয় সরকার বসিয়ে কি পাবেন? আবার একটা নির্বাচন? যারা আজ এই তৃতীয় ফ্রন্টের ছাতার তলায় সামিল হয়েছেন তারা এসেছেন, নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচাতে আখের গোছাতে — দেশের জন্য নয়। দেশের মানুষের এদের স্বরূপ জানতে বাকি নেই। কারোরই সর্বভারতীয় গ্রহণযোগ্যতা নেই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এক জনসভায় একেবারে সঠিক কথাই বলেছেন। দেশকে সঠিকভাবে নেতৃত্ব আর দিশা দেখানোর ক্ষমতা কংগ্রেসের পরে একমাত্র বিজেপিরই আছে। অন্য কোনও দলের নেই। অতীতে এই সত্য বারবার প্রমাণিত হয়েছে। সর্বভারতীয় দল বিজেপি-র সঙ্গে বর্তমানে, তৃতীয় ফ্রন্ট সাম্প্রদায়িকতার ধুয়ো তুলে দূরত্ব বজায় রাখতে চায়। কিন্তু এই বিজেপির সঙ্গে প্রয়াত রাজীব গান্ধীকে ঠেকাতে জ্যোতিবাবুদের বিজেপির সর্বভারতীয় নেতৃত্বের সঙ্গে একই মঞ্চে ব্রিগেডের সমাবেশের কথা দেশের মানুষ ভুলে যাননি। আসলে বামপন্থীদের কোনও নীতিই নেই। সুবিধাবাদীতাই এদের প্রধান নীতি। যখন এরা যেদিকে সুবিধা দেখে, সেদিকে ঢলে পড়ে, এটাই বাস্তব সত্য। তাই বর্তমান নিরীখে বলা যায় যে, তৃতীয় ফ্রন্ট গঠনের প্রয়াস, একটা স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়।

সুশান্ত কুমার দে, গ্রিন পার্ক, কলকাতা-১০৩

বামফ্রন্ট সরকারের শিল্পায়নের নামে দুর্বৃত্তায়ন

শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মহাশয় প্রায়ই অভিযোগ করে থাকেন বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির বিরোধিতার জন্যই পশ্চিমবঙ্গে শিল্পায়ন সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু একবারও উল্লেখ করেন না গত ৩২ বছরে বাম জমানায় পশ্চিমবঙ্গে কেন ৬০ হাজারেরও বেশি কলকারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। একদা ভারতের শেফিল্ড নামে খ্যাত হাওড়া শিল্পাঞ্চল এখন মৃত। ভারতের রাঢ় অঞ্চল নামে খ্যাত দুর্গাপুর-আসানসোল শিল্পাঞ্চল বর্তমানে মুমূর্ষু, ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল শ্মশানে পরিণত হয়েছে, জি টি রোডের ধারের শিল্পগুলির কঙ্কাল পড়ে রয়েছে। এ রাজ্যে এক সময় কমপিউটার ঢুকতে না দেওয়ার কারণে, রাজ্যের বেকারদের খেসারত দিতে হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় একবারও উল্লেখ করেন না যে, পশ্চিমবঙ্গ সারা ভারতে শিল্পে এক সময় প্রথম স্থান অধিকার করেছিল, সেই পশ্চিমবঙ্গের এই করুণ অবস্থার জন্য দায়ী কে বা কারা? পশ্চিমবঙ্গে নথিভুক্ত বেকারের সংখ্যা ৭৫ লক্ষেরও বেশি কি কারণে? মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় প্রায়ই আক্ষেপ করেন বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির বিরোধিতার কারণেই টাটা কোম্পানী সিঙ্গুরে 'ন্যানো' গাড়ির কারখানা গুটিয়ে নিল। ওই কারখানা সিঙ্গুরে হলে ৬ হাজার বেকারের মুখে হাসি ফুটত। কিন্তু একবারও উল্লেখ করেন না প্রায় ১ লক্ষ কৃষককে বাস্তুচ্যুত করে, জীবিকাচ্যুত বা কর্মহীন করে সিঙ্গুরে যে হাজার একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল তাদের কতজন ওই 'ন্যানো' কারখানায় চাকরি পেত? তিনি ভালমতোই জানেন অত্যাধুনিক মোটর গাড়ি কারখানায় উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত পরিবারের ইঞ্জিনিয়ার টেকনোলজিস্টরাই সেখানে চাকরি পেত। কৃষক পরিবারের স্বল্প শিক্ষিত

জনমত

খুব কম লোকেরই সেখানে চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। অসত্য কথনে বামপন্থীরা খুবই পটু। একটা সময় হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যাল লক্ষাধিক বেকারের চাকরি হবে বলে বামফ্রন্ট সরকার খুবই প্রচার চালিয়েছিল। বাস্তবে দেখা গেল সেখানে মাত্র পাঁচ-ছ'শো বেকারের কর্মসংস্থান হয়েছে। এখন চলছে কেমিক্যাল হাব নিয়ে ঢক্কা নিনাদ। প্রবাদ আছে বিশেষ শ্রেণীর জীব জল ঘোলা না হলে পান করে না। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারও তেমনই গন্ডগোল না পাকিয়ে কাজ করতে ভালবাসে না। আসলে বামফ্রন্ট সরকার "পোড়া মাটি নীতি" অবলম্বন করেছে। এরা ভালমতোই বুঝেছে এবার সরকারি ক্ষমতা থেকে সরে যেতে হবে। তাই যাওয়ার আগে সব কিছু তছনছ করে দিয়ে যেতে চেষ্টা করছে। উদ্দেশ্য এর পরে যারা ক্ষমতায় আসবে তাদের প্রবল জনরোষের মুখে পড়তে হবে। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে ফের ক্ষমতায় ফিরে আসা। কিন্তু "সেদিন কি হবে মা তারা?"

আসলে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের শিল্পায়ন আসলে ধাপ্পাবাজী বা মিথ্যাচার ছাড়া অন্য কিছু নয়। একথা সত্য শিল্প আকাশে হয় না। কিন্তু সেজন্য ৩/৪ ফসলি কৃষিজমি অধিগ্রহণ করতে হবে? পশ্চিমবঙ্গে ৮৮ লক্ষ ৭৫ হাজার হেক্টর জমির মধ্যে ১৮ লক্ষ একর অনুর্বর ও অকৃষি জমি রয়েছে। বন্ধ হয়ে যাওয়া কলকারখানাগুলির অধিকারে ৪০ হাজার একর জমি পড়ে আছে। তা সত্ত্বেও বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন শিল্প এবং বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠনের জন্য মোট ১ লক্ষ ৪০ হাজার একর জমি দখল করার লক্ষ্যে এগুচ্ছেন। এই জমির প্রায় সবটাই উর্বর কৃষিজমি। তাই সরকার বিভিন্ন রকম আন্দোলন এবং বিক্ষোভের মুখে পড়ছেন। সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, কাটোয়া, ডানকুনি, নয়াচর সর্বত্রই সরকার বাধা পাচ্ছে, আন্দোলন, বিক্ষোভের সম্মুখীন হচ্ছে। তা সত্ত্বেও সরকার অনুর্বর কৃষিজমি বা বন্ধ কলকারখানার জমি অধিগ্রহণ না করে উর্বর কৃষিজমি অধিগ্রহণ করে সেখানকার কৃষিজীবীদের উৎখাত করতে সচেষ্ট কেন? সিঙ্গুরের কৃষিজীবীরা সিপিএম-এর অনুগত

(এরপর ১৩ পাতায়)

পরম্পরা

হিন্দু সঙ্ঘশক্তির অনন্য পথিকৃৎ

আদি শঙ্করাচার্য

সোমনাথ নন্দী

শুরু করা যাক স্বামী বিবেকানন্দকে দিয়ে। আধুনিক কালে তিনি এই দেশকে যেভাবে নিরীক্ষণ করেছিলেন, তাকে বৈজ্ঞানিক বললে অত্যুক্তি হয় না। ভারতাত্মার প্রতিটি স্পন্দনকে তিনি আত্মগত করে নিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন "সমগ্র মানবজাতির জীবনকে সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ করিবার জন্য প্রত্যেক জাতিকে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য পালন করিতে হয়। নিজ নিজ জীবনের উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করিয়া প্রত্যেক জাতিকেই সেই সেই ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হয়। রাজনীতিক বা সামরিক শ্রেষ্ঠতা কোনওকালে আমাদের জাতীয় জীবনের উদ্দেশ্য নহে। আমাদের জাতীয় জীবনের অন্য উদ্দেশ্য আছে। তাহা এই সমগ্র জাতির আধ্যাত্মিক শক্তি সংহত করিয়া এক বিন্দু আধারে রক্ষা করা এবং যখন সুযোগ উপস্থিত হয়, তখনই এই সমষ্টিভূত শক্তির বন্যায় সমগ্র পৃথিবী প্লাবিত করা।"

ভারতে ধর্মের ইতিহাসে ঠিক এই ঘটনাই ঘটেছে বারবার। মহাভারতের যুগ থেকে পর্যালোচনা করা যাক। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আজ থেকে সাড়ে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নেতৃত্বে বিবদমান ভারতের বুকে প্রকৃত সঙ্ঘশক্তি সম্পন্ন যে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, কাল প্রভাবে তা ক্ষয়িষ্ণু হলে, তার ৮৫০ বছর পর ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাব ও প্রচলিত ধর্মের সংস্কার সাধন করে নবরূপে প্রচলন ও সঙ্ঘশক্তি স্থাপনের প্রচেষ্টা। বাস্তবে ভগবান বুদ্ধ সমসাময়িকতাকে মাথায় রেখে সঙ্ঘশক্তি স্থাপনের কথা ভাবেন। এবং সঙ্ঘশক্তিকে বৌদ্ধ ধর্মের ত্রি-স্তম্ভের অন্যতম স্তম্ভ হিসাবে স্থাপন করেন।

যার বৃদ্ধি আছে তার বিনাশও আছে। প্রকৃতির এই আপ্তবাক্যকে ঘিরে বৌদ্ধ ধর্ম এক সময় হীনবল হলে, ধর্মসংস্থাপনের জন্য ভারতের বুকে বুদ্ধের ১২২৪ বছর পর আবির্ভূত হলেন ভগবান শঙ্করাচার্য। অমিত ঐশী প্রজ্ঞা অনন্ত জীবনী শক্তি আশ্রয় করে। সনাতন বৈদিক ধর্মের মর্মজ্ঞাতারা চিহ্নিত করেছিলেন এবং করেছেন তাঁকে শিবাবতার রূপে।

আচার্য শঙ্করের আগমন ভারতের জাতীয় জীবনের এক চরম বিপর্যয়ের সন্ধিক্ষণে। সনাতন, সার্বজনীন সত্যের আকর অপৌরুষের বৈদিক জীবন তখন উৎস বিচ্যুত। সনাতন বৈদিক ধর্ম সে সময় হিন্দু ধর্মের কায়ায়। বিধর্মী উচ্চারণ অভিঘাতে হিন্দু ধর্মও বৌদ্ধ ধর্মের মতো কদাচার কবলিত তখন। বিভক্ত নানা সঙ্কীর্ণমতবাদে।

আচার্য শঙ্করের মহাবতারণ, তাঁর জীবন সাধনা ও শিক্ষা নিমজ্জমান সেই সনাতন ধর্মের মুমূর্ষ সত্তাকে আবার প্রাণ প্রাচুর্যে স্পন্দিত করে তুলল। সুপ্রতিষ্ঠিত করল তাকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর। অনন্তকালের স্থায়িত্ব দিয়ে। হিন্দুধর্ম ও সমাজ জীবনে ঘটল বৈপ্লবিক পরিবর্তন।

আচার্য শঙ্করের পরিচয় কেবল প্রতিভাধর দার্শনিক হিসেবে নয়। তিনি ছিলেন সত্যদ্রষ্টা ঋষি। এই ঋষিত্বের সংজ্ঞা আলোচনাকালে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "তিনিই ঋষি, যিনি ধর্মকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করেছেন। যাঁর কাছে ধর্ম কেবল পুঁথিগত বিদ্যা, বাগবিতন্ডা বা তর্কযুক্তি নয় — সাক্ষাৎ উপলব্ধি। অতিন্দ্রিয় সত্যের যেন মুখোমুখি সাক্ষাৎকার। উপনিষদে বলা হয়েছে — এঁরা সাধারণ মানুষ নন, মন্ত্রদ্রষ্টা।"

আচার্য শঙ্করের ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য, তিনি অনন্ত মেধা আর প্রজ্ঞাঋদ্ধ বাগ্মীতার অধিকারী। অপরোক্ষ অনুভূতির প্রকাশিত প্রেরণাই তাঁর জীবনের অন্যতম উৎস। দেহে থেকেও দেহাতীত। মানব হয়েও মহামানব। লোকবাসী হয়েও লোকোত্তর। যে পরিচয় তিনি দিয়েছেন স্বরচিত বিবেক চূড়ামণিতে — অহেয় মনুপাদেয়ং মনোবাচ্য মগোচরম্ / অপ্রমেয় মনাদ্যন্তং ব্রহ্ম পূর্ণমহং মহঃ। অর্থ হল আমি অত্যাজ্য, অনুপাদেয়, বাক্যমনাতীত, অপ্রমেয়, অনাদি অনন্ত তেজস্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম।

মাত্র ৩২ বছরের জীবন পরিক্রমায় তিনি যা করেছিলেন, বর্তমান কালের বিশ্বের বিখ্যাত পণ্ডিত গবেষকরা তা ভাবতে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যান। কি করেননি তিনি। সনাতন বৈদিক ধর্ম তথা হিন্দুধর্মের নিমজ্জমান তরণীকে তিনি নিজ শক্তিতে পুনরায় ভাসমান করে তুলেছিলেন। বেগবান করেছিলেন তাকে। শাস্ত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারের মাধ্যমে বেদান্ত প্রতিপাদ্য সনাতন হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেছিলেন। প্রবর্তন করেছিলেন বিলুপ্ত প্রায় পঞ্চ মহাযজ্ঞ প্রভৃতি বৈদিক কর্মানুষ্ঠানের।

আচার্য শঙ্কর যা করেছিলেন, তা আপন ঐশী প্রজ্ঞার নিরিখে। ত্রিকালজ্ঞ ঋষিদের মতো তিনি দেখতে পেয়েছিলেন আগামী ভারতের ভবিতব্যকে। সনাতন ধর্মের পরাবস্থাকে। বৌদ্ধ ধর্মের উত্থান ও পতনের ইতিহাস সম্যকজ্ঞাত ছিলেন তিনি। "সঙ্ঘশক্তি কলৌযুগে" আপ্তবাক্যটির গভীরতা তিনি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। বৌদ্ধ দের সঙ্ঘারামগুলির পতনের কারণ তিনি জানতেন। তাই হিন্দু সঙ্ঘশক্তিকে সুদৃঢ় ভিত্তির

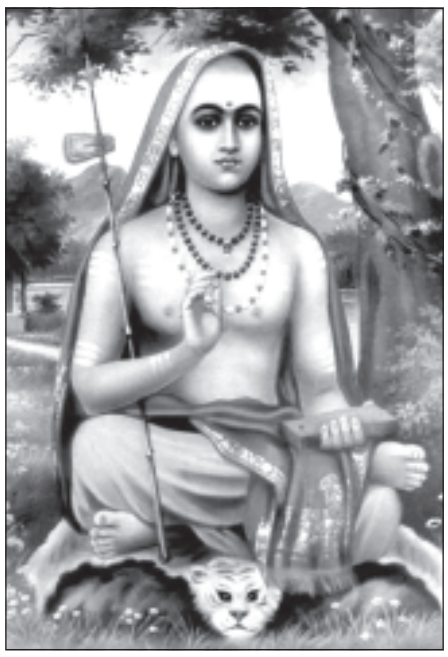

ওপর প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন। যা কালের দংশনে বিবর্ণ হবে না, নূজ্য হবে না। থাকবে স্বঅর্জিত জীবনীশক্তিতে ভর পুর।

আচার্যের দশনামী সম্প্রদায় প্রবর্তন সে স্বপ্নের অভ্রান্ত পরিণতি। যুগের অক্ষয় কীর্তি। সনাতন ধর্মের পুণ্যসলিলে চিরপ্রবাহমানতা অক্ষুণ্ণ রাখার বাস্তবসম্মত ব্যবস্থা। কালে এই দশনামী সম্প্রদায়ের সঙ্ঘশক্তি হিন্দুধর্মের মরাগাঙে এক অনন্ত জোয়ার সৃষ্টি করে।

তিনি প্রথম সন্ন্যাসী শিষ্য পদ্মপাদকে বলেছিলেন, কোনও বিদ্যা বা সাধনা সম্প্রদায়গত না হলে স্থায়ী হয় না। এই বেদান্ত সাধনার আদর্শকে বিশ্বে অশেষ কল্যাণকররূপে স্থায়ী করার জন্য সন্ন্যাসী সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা কর। ভারতের চারপ্রান্ত — উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চি মে তৈরি হবে চার মঠ। ত্রোটক, সুরেশ্বর, পদ্মপাদ ও হস্তামলক হবে চতুর্মঠের চার মঠাধীশ। বাকি শিষ্যবর্গ হবে তোমাদের সহকারী। তোমাদের শিষ্যরাও নিজ নিজ গুরুকে আশ্রয় করে থাকবে। এইভাবে ভারতভূমিকে চারভাগে বিভক্ত করে ধর্ম প্রচারে ব্রতী হও।

আচার্যের নির্দেশ চার মঠ হবে যথাক্রমে, বদরিকাশ্রম (উত্তর), রামেশ্বরধাম (দক্ষিণ) পুরীধাম (পূর্ব) ও দ্বারকায় (পশ্চি ম)। অভিহিত হবে জ্যোতির্মঠ (যোশীমঠ), শৃঙ্গেরীমঠ, গোবর্ধন মঠ ও সারদা মঠ নামে। গিরিপর্বত, সাগর, পুরী, ভারতী, সরস্বতী, বন, অরণ্য, তীর্থ ও আশ্রম এই দর্শনার্থী সন্ন্যাসীকুল চার মঠের অধীনে থেকে মঠের নিয়ম ও নির্দেশানুসারে ধর্মানুষ্ঠান করবে। মঠ পরিচালনার জন্য তাঁর প্রবর্তিত মঠাম্না বা মঠ সংবিধান এক কালজয়ী মহানুশাসন যা বেদবৎ অলঙ্ঘনীয়। জনসাধারণ বিরুদ্ধ ধর্ম আচরণ করছে কিনা মঠাধীশগণ নিজ নিজ প্রান্তে বা এলাকায় সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবেন এবং সর্বদা ভ্রমণরত থাকবেন। মঠে স্থায়ীভাবে বাস অনুচিত।

পবিত্র, জিতেন্দ্রিয়, বেদ-বেদান্ত পারঙ্গম, সর্বশাস্ত্রবিদ্, যোগারূঢ় সন্ন্যাসীই হবেন শঙ্করাচার্যের গদিতে অভিষেকের উপযুক্ত। এক আচার্যের অবসানে বা গদিত্যাগে, উক্ত লক্ষণযুক্ত অপর সন্ন্যাসী উক্ত গদিতে আসীন হবেন।

ত্রিকালদর্শী এই ঈশ্বরাবতার আপন ঐশী দৃষ্টিবলে ভারতের আগামী ঝঞ্ঝাপূর্ণ দিনগুলিকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাই বাস্তবসম্মত পরিকল্পনার মাধ্যমে চতুর্মঠ বা চার ধর্ম দুর্গ স্থাপনের মধ্য দিয়ে যেমন সনাতন ধর্মের সুরক্ষাকে সুনিশ্চি ত করতে চেয়েছিলেন, তেমনি দেখেছিলেন এক অখণ্ড, অবিভক্ত, কল্যাণকারী ভারতবর্ষের স্বর্ণপ্রতিমাকে। যা তাঁর মহাসমাধির ১০০০ বছর পর সত্যে পরিণত হলেও, সে অখণ্ডতা স্থায়ী হয়নি। এর জন্য অবশ্য দায়ী গরিষ্ঠ সংখ্যক ভারতবাসীর সহজাত তামসিকতা, ঐতিহ্যের প্রতি উদাসীনতা ও পরাধীন মানসিকতা। কিন্তু আচার্য সৃষ্ট সঙ্ঘশক্তি হিন্দু বলয়কে বেঁধে রেখেছে এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে, প্রাণবন্ততার অটুট নিগড়ে, অস্মিতাবোধের অনির্বাণ দীপ্তিতে।

মশলা চিকিৎসা ঃ এলাচ

শিবাজী রাজে।। এলাচ। ছোট হোক কিংবা বড়; সবক্ষেত্রেই এর সুগন্ধী রসনার তৃপ্তি ঘটাতে জুড়ি মেলা ভার। এলাচ সাধারণত দুই ধরনের হয় — ছোট এলাচ এবং বড় এলাচ। ভালমন্দ সকল রন্ধন কার্যে এর ব্যবহার নিত্যদিন। ছোট এলাচ আকারে ছোট ও হালকা সবুজ রঙের হয়। বড় এলাচ আঙুলের এককড়া পর্যন্ত লম্বা ও কালচে রঙের হয়ে থাকে। দুই ধরনের এলাচই নানান খাদ্য দ্রব্যে রসনা তৃপ্তির খাতিরে সদা প্রয়োগ হয়ে থাকে। এলাচের ইংরাজি নাম কার্ডামম্ এবং এর ব্যায়োলজিক্যাল নামটি বেশ বড়সড় ধরনের — ইলেকট্রারিয়া কার্ডামম্ মাটন অ্যামোসাম সুবুলার্বাম রক্স। এর বায়োলজিক্যাল নামের সাথে সাথে এর কাজের পরিধি নেহাত কম নয়। বলতে গেলে বেশ বড় ধরনেরই। ভারতের প্রায় সব প্রদেশের খাদ্য রসিকরা এর পূর্ণ ব্যবহার করে থাকেন। আর বাঙালীদের কথা তো বলার নয়,প্রায় সর্বজনবিদিত। মশলাদার পদকে সুস্বাদু ও সুগন্ধী করতে এলাচ-গরম মশলার অন্যতম গ্রহণযোগ্য মিশ্রিত উপাদান। এলাচের গুণমানের কথা হাতে গুনে বলা বেশ কঠিন। প্রায় সব খাদ্যেই-এর প্রয়োগ হয়। বাঙালীদের রসনা প্রিয়তা সমগ্র পৃথিবীর জানা। তাই বাঙালী বা বাংলার নানান পদে ব্যবহার প্রচুর। সিকিমের রংপোতে মদের কারখানায় এলাচের মদও প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। এলাচকে খাবার শুরু থেকে শুরু করে খাবার শেষ পর্যন্ত ব্যবহার করা যায় বা হয়। ঠান্ডা সরবতে ,গৃহে আসা অতিথি থেকে শুরু করে রসালো পানে এলাচের ব্যবহার

হয়। এলাচকে সাধারণত দইয়ের লস্যিতে, নানান মিষ্টান্ন দ্রব্যে, মাছের কালিয়া, মাংসের ঝোল, মাছের মুড়িঘন্ট, মাংসের রোষ্ট, মশলা পনীর, দইবড়া, বিরিয়ানী, পোলাও, বাঁধাকপি, ফুলকপির তরকারি থেকে শুরু করে আলুপটলের তরকারি কিম্বা ধোঁকার ডালনা অথবা ডিমের কারি সর্বত্রই এর প্রয়োগ খাদ্যের স্বাদ, গন্ধ ও গুণগত স্বাদ বৃদ্ধি ঘটায়। এখন যদি মনে জাগে কি কি উপাদান সংযুক্তি দিয়ে এলাচের অন্তর আত্মা গঠিত, তাহলে বলতে হয় — এলাচের ভেতর গিনিওল ভোলাটাইল ওয়েল, আলফা-টারপিনিওল সাইরেসিন একটেট, Sesqiterpenses A এবং চ, পিনিন, মনোটারপিন, হাইড্রোকার্বন, ১, ৮-সিনাওল লিনালোল, এট্রেট, বিশুদ্ধ জলে দ্রবীভূত করে দেখা গেছে ০.৫ শতাংশ প্রয়োজনীয় তেল তার মধ্যে প্রধান বা নির্গুণ ফ্যাটি অ্যাসিড, ক্যাপ্রিলিক, ক্যাপরইক, পালসিটিক, ওলেইক লিকলেইক অ্যাসিড, চসটোসটেরল ইত্যাদি উপাদান স্নেহ জাতীয় তেলে বিদ্যমান।

এলাচের ঔষধি গুনাগুণ ঃ (১) এলাচ মিষ্টি দ্রব্য, ঠান্ডা পানীয় ও সুরা প্রজাতীয় পানীয়ে ব্যবহার হয়। (২) এলাচ দানা থেকে নিষ্কাষিত তেল থেকে চোখের ঔষধ প্রস্তুত হয়। (৩) এর বায়ুরোগ হরণকারী ক্ষমতা যথেষ্ট, তাই এলাচ পান-পাতার সাথে খেলে উপকার পাওয়া যায়। (৪) রোগীর রুচি বৃদ্ধি করতে ও বলবর্ধক টনিক হিসাবে এর ব্যবহার হয়। (৫) এলাচের থেকে মূত্রবর্ধক হজমকারক ও মহিলাদের ঋতু সংক্রান্ত রোগ ঠিক হয় ।

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

পড়ুন ও পড়ান

আলোর দিশারী ছায়া কোলে ও স্ব-সহায়ক গোষ্ঠী

মিতা রায়।। আজকের দিনে একটা কথা খুবই শোনা যায় 'বিশ্বায়ণ'। মানে বুঝুক বা না বুঝুক প্রায় ছোট-বড় সকলের মুখেই ঘোরে একথা। তবে হ্যাঁ, এ কথা ঠিক, বর্তমান দিনে সমগ্র বিশ্ব চলেছে এক গতিতে — সে গতি এতই দ্রুত — যার ফলে আজকের দিনে মানুষ হারিয়ে ফেলছে তার মূল্যবোধ, সামাজিকতা সততা — শুধু যান্ত্রিকভাবেই ছুটে চলা ''আরো চাই, আরো যে চাই' — এর তাগিদে।

এই ছন্দে অতি আধুনিক যুগে পুরুষের পাশাপাশি মহিলারাও ছুটছে। শিক্ষা-দীক্ষার যেমন সুযোগ মিলছে, স্বপার্জিত হবার বিভিন্ন কাজও মেয়েরা করতে সক্ষম হয়েছে আর তার সঙ্গে অর্থনৈতিক প্রলোভন, রকমারি বিনোদনের প্রতিও তাদের লোলুপতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাঠককুলের কাছে গত কয়েকটি সংখ্যায় 'অঙ্গনা'র পাতায় তুলে ধরা হয়েছিল, এত কিছু পথ সামনে থেকেও শিক্ষিতা আর্থিক সচ্ছল মহিলারা কেন সন্ন্যাসিনী হচ্ছেন। বিশ্বায়ণের প্রভাব কি তাদের প্রভাবিত করছে না? তাদের বক্তব্য — আত্মিক শান্তি আসে শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক পরিমন্ডলে। এ তো উচ্চশিক্ষিত সুপ্রতিষ্ঠিত মহিলাদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু সাধারণ ঘরের মহিলারা কী করবেন! চিরদিনই আমাদের সমাজের গ্রামীণ সভ্যতা শহরের মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্তদের শিক্ষা-সংস্কৃতি উন্নত মানসিকতা এবং স্বাবলম্বন হওয়ার তুলনায় অনগ্রসর। কেননা, জেলার গ্রামগুলিতে সেভাবে আলোকপাত করা হয়নি। কিন্তু ইদানীং অবশ্য বিশ্বায়ণ-এর হাওয়া তাদেরও স্পর্শ করেছে যার ফলে গ্রামের মহিলারা মাথা তুলে দাঁড়াতে শিখেছে। শিক্ষার আলোয় নতুন প্রজন্ম বুঝতে শিখেছে সমাজের মানুষ আজও অন্ধকারাচ্ছন্ন সংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ। তারা চেষ্টা করছে, সংগ্রাম করছে এই ঘেরাটোপ থেকে অন্ধবিশ্বাসী মানুষ

একটি মহিলা স্বয়ং সহায়ক গোষ্ঠী

বিশেষত মহিলাদের মুক্ত করতে। আজ আর গ্রামের মহিলারা স্বামীর চোখ রাঙানিকে ভয় পায় না। আর্থিক স্বাবলম্বী হতে সোচ্চার হচ্ছে এবং তাদের জন্যই বিভিন্ন জেলায় জেলায় গড়ে উঠছে স্বনির্ভর গোষ্ঠী। এদের প্রতি সমাজসেবার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসছেন বেশ কিছু উদ্যোগী মহিলা।

হুগলির সিঙ্গুর ব্লকের রামচন্দ্রপুর গ্রাম আজকের রাজনীতিতে এক বিতর্কিত নাম। এখানে গড়ে ওঠা এমন একটি স্ব-নির্ভর প্রকল্পের কথা তুলে ধরা হচ্ছে। হুগলির এই গ্রামের স্ব-রোজগার যোজনার প্রসঙ্গে প্রথমেই উঠে আসবে ছায়া কোলের নাম। যিনি জীবনযুদ্ধে আত্মপ্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর দীর্ঘ লড়াই তাঁকে শুধু প্রতিষ্ঠা দেয়নি;তাঁকে সম্মান-মর্যাদা পাইয়ে দিয়েছে। শুধু নিজে নয়, গ্রামের আরও পাঁচজন দুঃস্থ মহিলাদের সমাজে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার পথ দেখিয়েছে। প্রায় বারো বছর আগে ছায়া কোলে তখন কৈশোরোত্তীর্ণা। সাইকেলে চেপে একা রাস্তায় গেলে গ্রামের মানুষজনের কাছে তাকে কটু কথা শুনতে হয়েছে। কিন্তু জেদী মেয়ে ছায়া কোনওদিকে কর্ণপাত না করে, গ্রামের পথে সাইকেলে চেপে দূরে যেত কাজ শিখতে। অনেক ছোটাছুটির পর একটা কাজও পেয়ে যায়। '৯৬-তে ডি আর ডি এ-র ডোকরা প্রকল্প শুরু হয়। এ ব্যাপারে তাঁর মুখেই শোনা : ছ'মাসের প্রশিক্ষণ ছিল। জুটের, ফোমের ব্যাগ, টেলারিং প্রভৃতি ছিল শিক্ষণীয়। বৃত্তি পাওয়া যেত ৩০০.০০ টাকা। এর থেকে ১০০ টাকা কেটে জমা রাখা হত। প্রশিক্ষণ শেষ করে ওই জমা টাকা দিয়ে মেশিন কেনা হয়। ডি আর ডি সি থেকে ২৫ হাজার টাকাটাও পাওয়া যায় '৯৭ তে। লোকমুখে রামচন্দ্রপুর এস জি এস ওয়াই গোষ্ঠীর নাম ছড়িয়ে পড়ে। ওই প্রকল্পে কাজ করার সময়ে স্বর্ণজয়ন্তী ও স্বরোজগার যোজনার সুযোগ আসে। এই নবগঠিত ব্যবস্থাপনায় ঋণ পাওয়া যায়। এই প্রকল্পের ঋণও পরিশোধ করা হয়েছে। ডি আর ডি সি গোষ্ঠীর কাছে সন্তুষ্ট হয়ে দুটি ব্যাগ তৈরির মেশিন দান করে। গোষ্ঠী নিজের টাকায়ও মেশিন কেনে।

বর্তমানে এই গোষ্ঠীর ১০ জন সদস্য। আর্থিক দিক থেকে স্ব-নির্ভর। গোষ্ঠীর মহিলারা পরিবারের দায়িত্বভার বহন করছে। গোষ্ঠীর কর্ণধার ছায়া কোলে। এই গোষ্ঠী বর্তমানে স্ব-নির্ভর তো বটেই, এর মহিলা সদস্যারা গ্রামের গর্ব। এই গোষ্ঠী নতুন গোষ্ঠীর জন্ম দিচ্ছে। শুধু গ্রামের নয়, জেলার মডেল হয়ে উঠেছে। মহিলাদের বাঁচতে শেখাচ্ছে, আত্মসচেতন করে তুলছে। শ্রীমতি কোলে গ্রামের মহিলাদের পারিবারিক পরিস্থিতি সরজমিনে দেখে নানাভাবে সেইসব মহিলাদের দৃষ্টি খুলে দেন। সৎ পরামর্শে তাদের আলো দেখান। ফলে, সমস্যার সুরাহা হওয়ায় গোষ্ঠীর নয়নের মণি ছায়াদেবী। শিক্ষাগত যোগ্যতায় ছায়া কোলে দশম শ্রেণী হলেও, আরও অনেক শিক্ষিতরা তার কাছে ঋণী।

ভারত সরকারের 'স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা' গ্রামাঞ্চলের দারিদ্র দূরীকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। হুগলি জেলায় এই প্রকল্পকে সঠিক রূপ দিতে জেলা গ্রামোন্নয়ন দপ্তর ও জেলা পরিষদের পাশাপাশি বিভিন্ন ব্যাঙ্ক, সমবায় সমিতি এগিয়ে এসেছে। আনন্দের বিষয়, এ পর্যন্ত ৫৭০৫ টা দল গঠিত হয়েছে। এদের মধ্যে শুধুমাত্র মহিলা গোষ্ঠী ৪,০৬৩টি। সুতরাং ছায়া কোলে গ্রামের এক প্রভাবশালী এবং পরোপকারী মহিলা — যার দ্বারা অনেক মহিলা উপকৃত হচ্ছে।

চিত্রকথা ।। অমর শহীদ মহান বিপ্লবী বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কে ।। ২

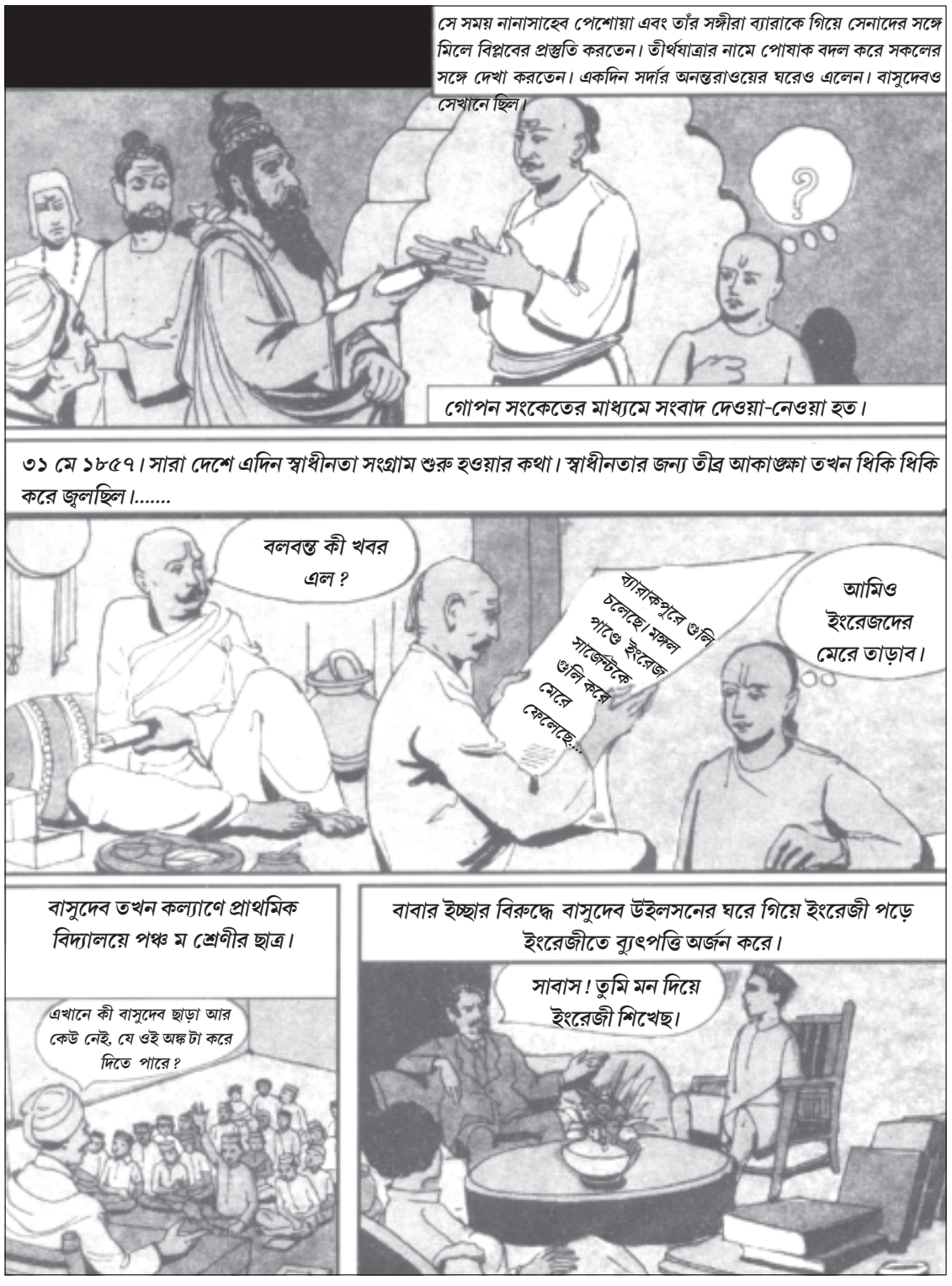

জীবনে বিজ্ঞান

।। নির্মল কর।।

রক্তের কোলেস্টেরল

অধিকাংশ হৃদরোগেরই প্রধান কারণ রক্তের কোলেস্টেরল। অস্ট্রেলিয়ার গবেষকরা একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন, যা মানুষের রক্তের কোলেস্টেরল পরিষ্কার করে দিতে পারে। কুইন্সল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন বিভাগের প্রধান গবেষক ডাঃ বিল চ্যাম ওই যন্ত্রের সাহায্যে প্রাণীদেহের রক্ত থেকে চর্বি জাতীয় উপাদান বের করতে সক্ষম হয়েছেন। মানবদেহে এর সাফল্য পাওয়া গেলে বহু মানুষ উপকৃত হবেন।

উড়ন্ত গাড়ি

কল্প-চলচ্চিত্রে বারবার দেখা গেছে; জেম্‌স বন্ডের ছবিতে তো অসংখ্য। বাস্তবে অবশ্য এখনও দেখা যায়নি উড়ন্ত মোটরগাড়ি। দু'বছরের মধ্যেই বাজারে এসে যাচ্ছে সেই উড়ন্ত গাড়ি। 'অটোভোলান্টর' নামের ২ লাখ পাউন্ডের ফেয়ারি ৫৯৯ জি টি বি মডেলটিতে ডানা জোড়ার প্রযুক্তিতে সফল হয়েছেন লন্ডনের মোলার ইন্টারন্যাশনাল অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়াররা।

রোগ নির্ণয়ে গন্ধবিচার

ইংল্যান্ডের একটি চিকিৎসা-বিজ্ঞান কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা নানা ধরনের রোগীর শরীরের গন্ধ নিয়ে গবেষণা করার পর আবিষ্কার করলেন এক অভিনব যন্ত্র, যা শুধু রোগীর মুখ বা ত্বকের গন্ধ বিশ্লেষণ করে জানিয়ে দিতে পারে রোগের প্রকৃতি ও গতিবিধি। রোগীর গায়ে যদি মিষ্টি গন্ধ পাওয়া যায় তাহলে তা ডায়বেটিস। আর যদি আঁশটে হয় তাহলে কিডনির রোগ। অত্যাধুনিক এই যন্ত্রটি রোগীর শরীরের রাসায়নিক পরিবর্তনকে চিহ্নিত করে রোগ নির্ণয় করে। গন্ধবিচার করে রোগ-নির্ণয়ের এই বিরল প্রতিভার অধিকারী ছিলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়।

ক্যান্সারমুক্ত দীর্ঘজীবনের খোঁজে

দিব্যি বেঁচে বর্তে ১২৫ বছর। শিগগিরই সম্ভব হতে পারে। দীর্ঘজীবন লাভ এবং ক্যান্সারের মোকাবিলায় মানবজীবনের জরুরি পরিবর্তন ঘটানোর দাবি করেছেন মাদ্রিদের গবেষকরা। টেলোমারেজ, পি-৫৩ ও পি-১৬ নামে জিনের কপি ইঁদুরের কোষে স্থাপন করেই নাকি ক্যান্সারমুক্ত দীর্ঘজীবনের রহস্য ভেদ করেছেন তাঁরা।

নতুন চিকিৎসা

মেরুদণ্ডের চোট সারাতে এখন আর অস্ত্রোপচার নয়। বেলুন কাইফোপ্লাস্টি নামে এক ধরনের চিকিৎসায় এবার মেরুদন্ডে চিড় ধরা এমনকী ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়াও নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে। সম্প্রতি অ্যাপলো গ্লেনেগেলস্ হাসপাতাল এক কর্মশালায় এ ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি দেখানোর পাশাপাশি এর সুফল সম্পর্কেও জানান। তাঁদের দাবি, এই পদ্ধতিতে এক রাতের মধ্যে চিকিৎসা সম্পূর্ণ করে বাড়ি ফেরা সম্ভব। তাঁরা জোরের সঙ্গে বলেন, 'মেরুদণ্ডের চোটের কারণে মানুষের জীবনের মান নেমে যায়। আমরা চিকিৎসার মাধ্যমে সেটাকে উন্নত করার গ্যারান্টি দিই।'

এবারের নির্বাচন ঃ মোগল শাসন অবসানের সুবর্ণ সুযোগ

শিবাজী গুপ্ত

প্রতিবেদনের হেডলাইন পড়ে ভড়কাবেন না। কাগজে কলমে মোগল শাসনের অবসান ঘটলেও, ভারতবাসী যে এখনও মোগল শাসনাধীনে রয়েছে, তা একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে।

দিল্লীতে নামকা ওয়াস্তে মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহের হাত থেকে শাসনদণ্ড স্খলিত হয়ে ইংরেজদের হাতে গেলেও তার আগেই নতুন পর্যায়ের মোগল সাম্রাজ্যের বীজ পোঁতা হয়েছিল। বাহাদুর শাহের এক পূর্বপুরুষ সম্রাট ফররুক শাহ কাশ্মীর থেকে রাজ কাউল নামে জনৈক ব্যক্তিকে দিল্লীতে তুলে আনে এবং বসবাসের ব্যবস্থা করে দেয়। তার কী গুণের জন্য কিংবা কী সেবার জন্য রাজ কাউলের এই রাজকীয় নেকনজর ও মেহেরবানি লাভ তা জানা নেই; তবে দুষ্ট লোকে নানা কুকথা বলে। এই কাউল বংশে (পরবর্তীকালে নেহরু বংশ) মোগলাই ঘরানার সঙ্গে যে সংস্পর্শে এসেছে তা জহরলাল নেহরু তার আত্মজীবনীতে লিখে গেছেন। মুসলিম রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছিল কিনা সে বিষয়ে নেহরু চুপচাপ ছিলেন। তবে মৌনং সম্মতি লক্ষণং কিনা তা প্রাজ্ঞজনেরা বুঝে নিবেন।

এসব কারণেই নেহরু পরিবারে হিন্দু হিন্দুত্ব ও হিন্দুয়ানি কখনোই প্রাধান্য পায়নি। মুসলমানী আদব-কায়দা, রীতি-নীতি খানা-পিনাই নেহরু পরিবারে প্রাধান্য পেয়েছে। নেহরুর নিজের স্বীকৃতি থেকে জানা যায় — তিনি শিক্ষায় ইংরেজ, সংস্কৃতিতে মুসলমান, আর দুর্ঘটনাবশত হিন্দু। এই দুর্ঘটনা কি সেটা 'বুঝে নাও মন যে জান সন্ধান'!

ইংরেজদের এদেশে আগমনে এবং দিল্লীর মসনদ দখলে খানদানী মোগল সাম্রাজ্যের পতন ঘটলেও তার ভূগর্ভস্থ মূল থেকে একটা লিকলিকে শাখা গজাল ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট সেই দিল্লীরই বুকে। এক মুগলের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাদেরই এক অধঃস্তন পুরুষের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে গেল — ভারতে নামান্তরে মুসলমান শাসন কায়েম করতে। ইনিই জওহরলাল — যার রক্তে ভারতমাতার প্রতি শ্রদ্ধা নেই, ভারতের মাটির প্রীতিমায়া নেই, হিন্দু ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা নেই, হিন্দু দেব-দেবীর প্রতি ভক্তি নেই। হিন্দু জীবন চর্চায় যার একান্ত ঘৃণা, তিনি শাসন ক্ষমতা হাতে পেয়েই হিন্দুদের ও হিন্দুস্থানের সর্বনাশ সাধনে কোমর বেঁধে নামলেন।

দেশবাসীর দুঃখ দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য দূরীকরণে যত্নবান না হয়ে তিনি প্রথমেই 'হিন্দু কোড' বিল পাশ করিয়ে হিন্দুদের যুগ-যুগান্তব্যাপী পরীক্ষিত ও দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সামাজিক কাঠামোতে ফাটল ধরালেন। মুসলমান কোড হল না, খৃস্টান কোড হল না — হল শুধু হিন্দু কোড, যেহেতু নেহরুর দৃষ্টিতে হিন্দুদের সমাজ জীবন অনুন্নত, আর পরধর্ম বিদ্বেষী ও হিংস্র ধর্মান্ধতার পরিপোষক ইসলাম ও খৃস্টানধর্ম হল প্রগতিশীল।

তারপর হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট পাস করিয়ে হিন্দু স্বামী-স্ত্রীর ব্যক্তিগত জীবনে ভাঙ্গন ধরিয়ে দিলেন। এখন কোর্ট -কাছারীতে হিন্দু নারীদের বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলায় ঠাঁই নেই ঠাঁই নেই অবস্থা।

তারপর ফ্যামিলি প্ল্যানিং বা পরিবার পরিকল্পনার নামে হিন্দু জনসংখ্যার হ্রাসে রাষ্ট্রশক্তি নিয়োগ করলেন। সীমিত পরিবারে হিন্দুদের প্রলুব্ধ করতে ইন্‌সেনটিভ্ দেবার ব্যবস্থা হল — হিন্দু কর্মচারীদের সন্তান সংখ্যা কমাতে স্পেশাল ইনক্রিমেন্ট, হিন্দু মেয়ে-পুরুষদের জননযন্ত্র অকেজো করতে অস্ত্রোপাচারের সস্তা ব্যবস্থা — 'হাম্ দো, হামারা দো' নীতি প্রয়োগ, 'এক বাচ্চে ঔর বস', স্লোগানে দেশ মাতানো হল। অর্থাৎ হিন্দু সংখ্যা হ্রাসে যত প্রকার ইন্‌সেন্‌টিভ প্রকারান্তরে মুসলিম ও খৃস্টান সংখ্যাবৃদ্ধি তে তার চতুর্গুণ ইন্‌টেন্‌সিভ বা হাইব্রীড ফলনে ইন্ধন জোগাল। তার ফলে ৬০ বছরে হিন্দু জনসংখ্যা শতকরা ৯০ থেকে ৭০-এ নেমে এলো, আর মুসলমান ও খৃস্টান জনসংখ্যা ১০ থেকে বেড়ে ৩০-এ উঠে গেল। আর এই অতি প্রজননের সঙ্গে ধর্মান্তর করে হিন্দু জনসংখ্যা কমাবার অবাধ অধিকার দেওয়া হল মুসলমান ও খৃস্টানদের — মাইনোরিটির বা সংখ্যালঘুদের পারিবারিক ও ধর্মীয় বিষয়ে সরকারি নির্দেশাবলী অনুসরণ থেকে ছাড় দিয়ে।

আর এ সবের পরিণতি হল একের পর এক বিধানসভা ও লোকসভা আসনগুলি হিন্দুদের হাতছাড়া হয়ে মুসলমানদের দখলে চলে যাচ্ছে। ১৯৫২ সালে যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে একজনও মুসলমান এম পি নির্বাচিত হতে পারত না, এবারের নির্বাচনে প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দল এত মুসলমান প্রার্থী দাঁড় করিয়েছে যে, আট / দশ জন মুসলমান এম পি নির্বাচিত হবার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

সারা ভারতেও একই হাল। যে ওড়িশায় মুসলমান দূরবীন দিয়েও খুঁজে পাওয়া যেত না, সে ওড়িশায় মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি হেতু বিধানসভায় মুসলিম এম এল এ নির্বাচিত হচ্ছে। পাঞ্জাব, হরিয়ানা — যেখান থেকে ১৯৪৭ সালের দাঙ্গার সময় মুসলমানরা ঝাড়ে বংশে উৎখাত হয়ে গেছে, সেখানেও মুসলমান ভোটারের সংখ্যা এমনভাবে বেড়েছে যে, মুসলমানদের ভোটের জন্য হিন্দু প্রার্থীরা তাদের পায়ে পড়ছে।

নির্বাচনের মাধ্যমে ভারতে মুসলমান রাজ্য স্থাপনের ভিত্তি স্থাপন করে গেছেন পণ্ডিত (মূর্খ) জওহরলাল নেহরু। কারণ তাদের বংশগত মুসলিম রীতি ও প্রীতির ধারা এখনও অব্যাহত তো বটেই বরং তা বেড়েই চলেছে। মুসলমান সন্ত্রাসীদের প্রতি তারা যে কঠোর হতে পারছে না, তার কারণ এখানেই নিহিত। মুসলিম যুবক ফিরোজ খানের সঙ্গে ইন্দিরা নেহরুর বিবাহ নিবন্ধন যে বংশধারা গড়িয়ে চলেছে, তাতে এই সন্ত্রাসীরা তো নেহরু গান্ধী গোষ্ঠীর জাত ভাই। তাদের ফাঁসির আদেশ কার্যকরী করতে যে এদের যে প্রাণ কেঁদে ওঠে। ইন্দিরা খান (গান্ধী) কেন আফগানিস্তানে গিয়ে বন-জঙ্গলের মাঝে মোগল বংশীয় বাবরের কবর খুঁজে বের করে মাল্যদান করে মোমজাত করেছিল, তার রহস্য তো দেশবাসীকে জানতে দেওয়া হয় না একারণেই। কাশ্মীর থেকে এই মোগল রক্তের ধারা দিল্লীতে বয়ে এসেছিল বলেই না নতুন মোগল শাসন নেহরু-গান্ধী গোষ্ঠীর উত্থান সম্ভব হয়েছিল। আর সে কারণেই রামমন্দির গড়তে এদের আপত্তি, কিন্তু রামসেতু ভাঙতে এই হিন্দু বিরোধী বংশের উৎসাহ।

কংগ্রেস নামে এই নয়া মোগল শাসন থেকে মুক্তি পাওয়ার এক মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত হয়েছে বর্তমান নির্বাচনে। সারা ভারতে এদের শাসনরজ্জ ঢিলে হয়ে এসেছে। এখন দরকার একটা সমবেত প্রচেষ্টা সমমতাবলম্বী জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীর। সেই আশঙ্কাতেই ত্রাহিত্রাহি রব উঠেছে নেহরু-গান্ধী গোষ্ঠীর ধোপা-নাপিত-চামার-মেথর-পোটা বহনকারী মহলে। এরা এস পি, আর জে ডি, এল জে পি, বি এস পি, এন সি পি, বি জে ডি, সি পি (আই এবং এম) ইত্যাদি নামে কংগ্রেসীদের ধ্বংসোন্মুখ দুর্গ রক্ষা করতে কোমর বেঁধে মাঠে নেমেছে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ রাজ্যে কংগ্রেস বিরোধী; কিন্তু দিল্লীতে মোগল ও খৃস্টান সেবক কংগ্রেসের যুক্ত শাসন বজায় রাখতে এককাট্টা। সেখানে বিজেপিকে রুখতে হবে এবং সোনিয়া গান্ধীর কাপড় কাচতে হবে। তা না হলে দেশের বাকী সর্বনাশটুকু সাধন করা যাবে না যে!

একটা নির্বাচনে দেশের আর্থিক দুরবস্থার কথা নেই, অনুপ্রবেশের মতো একটা জীবন্ত সমস্যার উল্লেখ নেই — শুধুমাত্র সেকুলারিজম মন্ত্র আওড়াও, আর বিজেপি'র মুন্ডুপাত কর এবং মুসলমানদের দুর্দশার জন্য কেঁদে ভাসাও। কিন্তু মুসলমানদের দুর্দশার জন্য যে মুসলমানরাই দায়ী সে সম্পর্কে একটি, কথা নয়। কারণ তাহলেই ভোটে ফক্কা।

সারা দেশের কথা বাদ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের কথাই বলা যাক। এ রাজ্যে সিপিএম-কে ভোট না দিয়ে, তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দেওয়ার অর্থ দিল্লীতে কংগ্রেসী কুশাসনকে মদত দেওয়া — অনেকেরই ইচ্ছা বিরুদ্ধ। সিপিএম হোক আর তৃণমূল কংগ্রেস হোক — এদের ভোট দেবার অর্থ হল পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম দৌরাত্ম্যে সমর্থন জানানো, মুসলিম অনুপ্রবেশে অনুমোদন জানানো, সারা রাজ্যে হিন্দু নারী নিগ্রহে নির্বিকার থাকা, জেহাদী, সন্ত্রাসী, তালিবানীদের জামাই আদরে-ভরণপোষণ করা ইত্যাদি।

সচেতন ও সজ্ঞান ভোটাররা সিপিএম এবং তৃণমূল — এই দুই দুষ্টগ্রহকে বর্জন করে বিজেপি প্রার্থীদের ভোট দিলে নিজেদের বিবেকের কাছে অন্তত জবাবদিহি করতে হবে না।

মঙ্গলনিধি

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার উত্তর কাশীনগর নিবাসী উচ্চ বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক পানান চন্দ্র হালদার স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহক। স্বস্তিকা পড়ে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি তার নাতনীর অন্নপ্রাশন উপলক্ষে ৫০০ টাকা মঙ্গলনিধি হিসাবে সমাজ সেবা ভারতীকে দিয়েছেন।

সংশোধনী

'স্বস্তিকা'-র ২৭ এপ্রিলের সংখ্যার ১৬ পৃষ্ঠায় সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকারে Nasta **স্থলে** Naphtha **পড়তে হবে।**

—স্বঃ স্বঃ

শিল্পায়নের নামে দুর্বৃত্তায়ন

(১০ পাতার পর)

নয়। সিঙ্গুরের বিধায়ক অন্য রাজনৈতিক দলের। সুতরাং টাটা কোম্পানীকে "ন্যানো" গাড়ির কারখানা তৈরি করার অজুহাতে সিঙ্গুরের বাসিন্দাদের বাস্তুচ্যুত করার শ্রেষ্ঠ উপায়। ৩২ বছর বামফ্রন্ট সরকারের অপশাসনে অন্যান্য এলাকার বাসিন্দারাও ক্রমশ সিপিএম বিরোধী হয়ে উঠছে। অবস্থা এমনই যে সিপিএম অনুগামীরাও এখন ক্রমশ সিপিএম বিরোধী হয়ে উঠছে।

অর্থাৎ যার স্বার্থে আঘাত লাগছে, এখন সেও সিপিএম বিরোধী হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করছে। দেশসেবক তথা বিধায়ক, সাংসদরাও যে দলীয় টিকিট পাচ্ছে না, সেও সিপিএম পরিত্যাগ করে অন্য বিরোধী রাজনৈতিক দলে নাম লেখাচ্ছে। সম্প্রতি বেশ কয়েকজন দেশসেবক তথা বিধায়ক এবং সাংসদ দলীয় টিকিট না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়েছেন। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে লড়াই করে জয়ী হতে না পারলে দেশসেবা করবেন কী ভাবে? এত দিন না বুঝতে পারলেও এখন সঙ্গে সঙ্গে বুঝে গেলেন সিপিএম, আর এস পি প্রমুখ জনগণের পার্টি নয়, ধান্দাবাজ প্রোমোটারদের পার্টি, শিল্পপতিদের পার্টি, টাটা-বিড়লাদের পার্টি।

অতএব দলত্যাগ করে অন্য রাজনৈতিক দলে নাম লেখালেন। নির্বাচনে দলীয় টিকিট পেলে হয়তো এ জ্ঞানোন্মেষ এদের হতো না। তখন কাস্তে হাতুড়ি তারার জন্য জান লড়িয়ে দিতেন, বাঘের মতো গর্জন করতেন। হয়তো আরও অনেক কিছু করতেন। তবে সে সুযোগ তো এখন নেই। অগত্যা মধুসূদন।

কেশব দাতব্য চিকিৎসালয়ের বিংশতি বর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপবিষ্ট (বাঁ দিক থেকে) ভরত ভূষণ, ডঃ ধ্রুব চক্রবর্তী। ডানদিক থেকে প্রথম ডঃ রাজীবলোচন ঘাঁটি।

কেশব দাতব্য চিকিৎসালয়ের কুড়ি বছর পূর্তি

আসানসোল জেলার দুর্গাপুর মহকুমার হেতেডোবা গ্রামের কেশব দাতব্য চিকিৎসালয় গত ১৯ মার্চ কুড়ি বছর পূর্ণ করল। আজ থেকে ২০ বছর আগে বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদের নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল এই হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয়। এদিনের অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য শিবির, রক্তপরীক্ষাসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে পরিষদের শিশু সংস্কার কেন্দ্রের শিশুরা গান ও সুভাষিত পরিবেশন করে।

এদিন ডাঃ রাজীব লোচন ঘাঁটিকে তাঁর কৃতিত্বের জন্য বিশেষভাবে সম্বর্ধনা জানানো হয়। প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার ভরত ভূষণ। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন ডঃ ধ্রুব চক্রবর্তী। তাঁর সভাপতিত্বেই সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হয়।

উত্তুরে উজানে সওয়ার তথাগত-তরণী

অর্ণব নাগ ।। রাজনীতিতে না এলে কী হতেন তিনি? এতদিনে নির্ঘাৎ ভারতীয় রেলের ডিরেক্টর হয়ে যেতেন। অন্তত তাঁর কর্মক্ষমতা আর একাডেমিক ট্র্যাকরেকর্ড তেমনই বলছে। তিনি ১৯৬১ সালে উচ্চ- মাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যের মধ্যে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেন এবং সেইসঙ্গে জগদীশ বসু ন্যাশনাল সায়েন্স ট্যালেন্ট সার্চ (JB-NSTS) বৃত্তিলাভ করেন। তাঁর পরবর্তী পড়াশুনো ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে শিবপুর বি ই কলেজে (অধুনা নাম BESU)।

কেন্দ্রীয় সরকার আয়োজিত রেলের সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় এরপর তিনি তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। যোগদান করেন ভারতীয় রেলে। অসাধারণ কর্মদক্ষতা তাঁকে নিয়ে যায় উন্নতির শিখরে। অতঃপর কল্লোলিনী তিলোত্তমার অন্যতম গৌরব মেট্রো প্রকল্পে বদলি হন এবং কালক্রমে চীফ ইঞ্জিনিয়ার পদে উন্নীত হন। ১৯৯০ সালে অকস্মাৎ ছেড়ে দেন রেলের চাকরি। যোগ দেন অধ্যাপনার কাজে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। একই সঙ্গে এসে পড়েন রাজনীতিতে। যোগ দেন ভারতীয় জনতা পার্টিতে।

এতক্ষণ ধরে যে যাঁর কথা বলতে চাইছি প্রার্থীর কথা বলার জন্য ধান ভানতে শিবের গীত গাইছি, তিনি আর যেই হোন 'স্বস্তিকার' পাঠকের কাছে মোটেও অপরিচিত নন। যাঁর বলিষ্ঠ লেখনী স্বস্তিকাকে সমৃদ্ধ করেছে বারেবারেই। ঠিকই ধরেছেন, সেই কৃতীর নাম তথাগত রায়। উত্তর কলকাতা লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী। যিনি লিঙ্কনের মতোই রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়ন, কালোবাজারি, ধান্ধাবাজি ঠেকিয়ে তা প্রসারিত করতে চান বুদ্ধিজীবীদেরও। বিভিন্ন পেশায় উচ্চপদে কর্মরতদের মধ্যে, তিনি পৌঁছে যেতে চান সমাজের উঁচু-নীচু সব স্তরে।

তাঁর বিরুদ্ধে এবার দুই প্রতিদ্বন্দ্বী —সিপিএমের মহম্মদ সেলিম ও তৃণমূলের সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। গতবারের সাংসদ সেলিমের ভাবমূর্তি শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডীতেই আটকে নেই, একাধিক আর্থিক দুর্নীতিতে জড়িয়ে গিয়েছে তাঁর নাম। সেলিম যে সংস্থার চেয়ারম্যান সেই ওয়েস্ট বেঙ্গল মাইনরিটি ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কর্পোরেশনের অফিসে ২৮ অক্টোবর ২০০৪-এ আগুন লাগে। যার ফলে পুড়ে যায় বহু মূল্যবান দস্তাবেজ। যার মূল্য অন্তত পক্ষে কুড়ি লক্ষ টাকা। যা উদ্ধারের আশা আর নেই।

ওয়াকিবহাল মহলের অনুমান এর পেছনে নাকি মহম্মদ সেলিমের হাত রয়েছে। এদিকে অপর প্রার্থী তৃণমূলের সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একাধিকবার দলবদলে তাঁর ইমেজ তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। তাই সব মিলিয়ে বলা যায়, এবারের নির্বাচনে উত্তরে 'অ্যাডভান্টেজ তথাগত'।

তথাগত বাবু স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় বলছেন, "আসলে উত্তর কলকাতায় বরাবরই একটা হিন্দু ভাবনার চোরাস্রোত ছিল। কিন্তু মার্কস-নেহেরুর চ্যালাদের পাল্লায় পড়ে তা প্রকাশ পেতে সঙ্কোচ বোধ করত।" প্রসঙ্গত, এবার ডিলিমিটেশনের ফলে উত্তর-পশ্চিম কলকাতা ও উত্তর-পূর্ব কলকাতা একত্রিত হয়ে উত্তর কলকাতা লোকসভা কেন্দ্রের জন্ম দিয়েছে। যার দরুণ মহানগরীর পশ্চিমস্থিত গঙ্গার ঘাটগুলি এবার তথাগত রায়ের কেন্দ্রের

অন্তর্গত। যার জন্য আশ্বাস দিচ্ছেন জিতলে পোর্ট ট্রাস্টের ওপর চাপ সৃষ্টি করে গঙ্গার ঘাটগুলি এবং মল্লিক ঘাটের ফুলের বাজার আমূল সংস্কার করার।

তাঁর অভিযোগ, উত্তর কলকাতার উন্নয়ণের জন্য না কংগ্রেস সরকার, না বামফ্রন্ট সরকার, না কখনও কিছু ভেবেছে, না কখনও কিছু করেছে। সামগ্রিকভাবেই উত্তর কলকাতাকে ফিরিয়ে দিতে চান তার হৃত গৌরব, এই কাজ করার জন্য জওহরলাল নেহেরু আরবান রিনিউয়াল মিশন নামক কেন্দ্রীয় সরকারি নিধি থেকে আরও বেশি টাকা আনার জন্য তিনি ইতিমধ্যেই অঙ্গীকারবদ্ধ। এছাড়াও নিজে রেলের লোক হওয়ার সুবাদে তাঁর পরিকল্পনায় রয়েছে চক্ররেল, পাতাল রেল সহ শিয়ালদহ ও কলকাতা স্টেশনে যাত্রীদের উন্নততর পরিষেবা প্রদান করা।

এবার নির্বাচনী প্রচারে তথাগতবাবুর মূল অ্যাজেন্ডা তিনটি। প্রথমত, মূল্যবৃদ্ধি, দ্বিতীয়ত, দেশের নিরাপত্তা ও সংখ্যালঘু তোষণ এবং তৃতীয়ত, শিল্পায়ন। শিল্পায়ন প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, "একদা সিপিএম যে ঘেরাও, অবরোধ, বন্ধের কর্মসূচী নিয়ে শিল্পোন্নয়ন স্তব্ধ করেছিল, তার বাকীটা আজ করছে তৃণমূল। সুতরাং এখানে শিল্প দূর অস্ত।" তিনি বুদ্ধদেবের তথ্য প্রযুক্তি ভজনাকে ভণ্ডামি আখ্যা দিয়ে বলেন, এরাই ১৯৮০তে কম্পিউটার প্রবেশ রোধ করেছিলেন; কম্পিউটার বসাতে দেয়নি গ্রীনলেস ব্যাঙ্ক, হংকং ব্যাঙ্কেও। যার ফল চাকরি না পাওয়া যুব সমাজকে এখনও ভুগতে হচ্ছে বলে তাঁর আক্ষেপ।

স্বাধীনোত্তর কালে রাস্তাঘাটের নামকরণ পুনরায় করা হলেও, তা লোকের মুখে বহুল প্রচলিত না হয়ে সেই বৃটিশ আমলের নামই কার্যত রয়ে যাওয়ার জন্য দায়ি করছেন কলকাতা পুরসভার অপরিণামদর্শিতাকে। উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝালেন, "যেমন, আপার সার্কুলার রোডের নামকরণ করা হয়েছে এ পি সি রোড, কে এ পি সি মানে বুঝবে যে সেটা হল Acharya Prafulla Chandra Road? যদি সেক্ষেত্রে প্রফুল্ল সরণী রাখা হত, তবে তা লোকের মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে যেত। তা না হয়ে লোকের কাছে ওটা এখন কয়েকটা অ্যালফাবেট মাত্র। অথচ রবীন্দ্র সরণী নাম তো দিব্যি চলছে।"

শিক্ষা-সংস্কৃতি আর সামাজিক চেতনায় সমৃদ্ধ ব্যক্তিত্বকেই সব সময় জিতিয়ে এনেছে উত্তর কলকাতা। সেক্ষেত্রে পার্টিগত চরিত্র বা পার্টিগণিতের হিসেব নিকেশ অতটা গুরুত্ব পায়নি সেখানকার লোকজনদের কাছে। গতবারটা বোধহয় ব্যতিক্রম। এর আগে সেখানে জিতেছেন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় বসু, অজিত পাঁজার মতো ভারতের সংসদীয় ইতিহাসের প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্বরা। তথাগত রায় তাঁদেরই না হয় উত্তরসূরী হলেন।

কাছের মানুষ, কাজের মানুষ তপন সিকদারেরই জয় দেখছে দমদম

অর্ণব নাগ ।। পা দুটি ফুলে ঢোল। ডাক্তার বলেছেন, বিশ্রাম নিতে। কিন্তু তিনি এতে নারাজ। জিগ্যেস করলুম, 'কি করে হল এমন?' তিনি জানালেন, 'ভোটের প্রচারে হাঁটাহাঁটির সময় রক্ত দ্রুত দেহের নীচে সঞ্চালিত হচ্ছে, তারপর বিশ্রাম নিলেও অত দ্রুত আর নীচ থেকে উপর দিকে সঞ্চালিত হচ্ছে না। তাই পা-টা ফুলে আছে।" বললুম, "প্রচারে যেতে কষ্ট হচ্ছে না?" হেসে মাথা নাড়লেন। আসলে গত পাঁচ বছর তাঁরা থাকা, না থাকার ব্যবধানটা খুব ভাল করেই অনুভব করেছেন কলকাতার উপকণ্ঠের মানুষজন। সর্বভারতীয় নিরীখে যে কয়েকটি হাইপ্রোফাইল কেন্দ্র রয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম এই কেন্দ্রটি। কারণ এই কেন্দ্রের সেই প্রার্থী নিজেই একজন লিজেন্ড। সেই ১৯৫৩ সাল থেকে এক অক্লান্ত রাজনৈতিক কর্মী। পাঠক এতক্ষণে হয়ত বুঝে গিয়েছেন আমি দমদম কেন্দ্রের কথা বলছি। আর প্রার্থী স্বনামধন্য তপন সিকদার।

এবার দমদমে লড়াইটা জমজমাট। ত্রিমুখী লড়াই-এ প্রার্থী সিপিএমের অমিতাভ নন্দী, তৃণমূল কংগ্রেস ও কংগ্রেস জোট প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সৌগত রায়, আর বিজেপির প্রার্থী বলাই বাহুল্য তপন সিকদার। এই তিন হেভিওয়েটের লড়াই-এ 'কাজের মানুষ, কাছের মানুষ' ফ্যাক্টরে একটু বোধহয় এগিয়ে থেকেই শুরু করবেন তপনবাবু। দমদমে গত পাঁচ বছরে এম পি ল্যাডের টাকা পরিকল্পনামাফিক খরচ না করতে পারার অভিযোগ উঠেছে অমিতাভ নন্দীর বিরুদ্ধে। অমিতাভবাবুকে গত পাঁচ বছরে দমদমে বিশেষ একটা কেউ দেখেনি। তাঁকে নিয়ে রসিকতা চালু হয়েছে রীতিমতো। বিরোধীদের মুখে মুখে ছড়া কাটছে, 'অমিতাভবাবু নমস্কার, গত পাঁচ বছরে প্রথমবার!'

তবে এবার ডিলিমিটেশনের ফলে দমদম লোকসভা কেন্দ্রের কিছু অদলবদল ঘটেছে। বেরিয়ে গেছে বেলগাছিয়া (পশ্চিম) বিধানসভা কেন্দ্র। ওই বিধানসভাটিকেও দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। বিধাননগর ও বেলগছিয়া (পশ্চিম)। বিধাননগর এমনিতেই বিরোধীদের শক্ত ঘাঁটি। তার ওপরে গত বছর ওখানে প্রায় ৬০ হাজার ভোটে এগিয়ে ছিলেন তপনবাবু। এ কথা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতে বিন্দুমাত্র দমলেন না। সাফ জবাব দিলেন, "৯৯-তে যখন জিতেছিলাম তখন তো দমদমের সাতটা বিধানসভাতেই এগিয়ে ছিলাম। বিধাননগর বেরিয়ে যাওয়া অবশ্যই জয়ের মার্জিনে কিছুটা প্রভাব ফেলতে পারে। জয়ের ক্ষেত্রে নয়।"গত নির্বাচনের সাথে এবারের নির্বাচনে মূল পার্থক্য হিসেবে ধরছেন তৃণমূলের প্রার্থী দেওয়াকে । তবে তিনি এতে বিচলিত নন। বললেন, "সিপিএমের বিরুদ্ধে মানুষের যে স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষোভ রয়েছে। সেই ক্ষোভের প্রতিফলনই দেখা যাবে আমার ভোটবাক্সে।" প্রচারে তুলে আনছেন বিগত এন ডি এ সরকারের সাফল্যকে। দমদমে আপনার মূল ইস্যু কি? তপনবাবু জানালেন, অবশ্যই মূল্যবৃদ্ধি। তাঁর কথায়, এনডিএ সরকার ত্নক্ষস্তুন্দ স্ন্দ্দন্দ্বপ্ত-কে সুন্দরভাবে কন্ট্রোল করতে পেরেছিল। এন ডি এ জমানার ২২ টাকার মুসুরির ডাল এখন মানুষ পাচ্ছেন ৫০ টাকায়, ৩৫ টাকার মুগডালের দাম হয়েছে কিলোপ্রতি ৭০ টাকা। তেলের দামও খুব বেড়ে গিয়েছে।'

'তাঁর লক্ষ্য নির্বাচনে জিতে বেকার-যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। কথায় কথায় ব্যক্ত করলেন তাঁর ক্ষোভ, "বাজপেয়ীজীর আমলে প্রতি বছর সাড়ে ৮৪ লক্ষ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু ইউ পি এ যুবকদের জন্য কিছুই করতে পারেনি।" ক্ষমতায় এলে এবার যুবকদের জন্য কোনও বিশেষ পরিকল্পনা? প্রত্যুত্তরে জানালেন লালকৃষ্ণ আদবানীর ঢব দ্দন্দ্দন্দক্ষ-এর কথা। যে প্রকল্প অনুযায়ী, বেকার শিক্ষিত ছেলেদের ১০ হাজার টাকার ল্যাপটপ দেওয়া হবে। কম্পিউটার দেওয়া হবে বিনা পয়সায়। তপনবাবু জানালেন এর মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে কৃষকরা যেমন চাষ আবাদের বিষয়ে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারবে, তেমনি যুবকদের সামনেও খুলে যাবে রোজগারের নতুন দিগন্ত। এছাড়াও তিনি বলছেন এই আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রাচীন ভারতীয় বিভিন্ন শাস্ত্র যেমন জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যোতিষ শাস্ত্র, বাস্তুতন্ত্র নব আনন্দে জাগরিত হবে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যও তথ্য-প্রযুক্তি শিল্পে উন্নয়নের বাণী শোনান, তো এর সঙ্গে আদবানীর তথ্য প্রযুক্তির পার্থক্যটা ঠিক কোথায়? তপনবাবুর বক্তব্য, আর সিপিএম মুখে এই শিল্পের উন্নতির কথা বললেও বন্‌ধের আওতা থেকে তথ্য প্রযুক্তি শিল্পকে ছাড় দিচ্ছে না। একদা এরাই কম্পিউটারের বিরোধিতা করেছিল।

তপন সিকদারের সঙ্গে কথা বললেই চলে আসে যোগাযোগ ব্যবস্থার কথা। তিনি যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী থাকার সময় এর আমূল সংস্কার করেছিলেন। তাঁর অভিযোগ, এখন বি এস এন এল সার্ভিস যথেষ্ট খারাপ হয়ে গিয়েছে। এর জন্য দায়ি করছেন ইউ পি এ সরকারের পরিকাঠামোগত সুযোগ সুবিধে, রিপেয়ারিং, রক্ষণা-বেক্ষণ-এর দিকে নজর না দেওয়াকে। তপনবাবুর বক্তব্য, "বি এস এন এল হল দেশের বৃহত্তম নেটওয়ার্ক। কিন্তু অসাধু ব্যবসায়ীদের অন্তর্ঘাতে তা আজ ক্ষতির মুখে পড়েছে। আমার সময় যা লাভজনক ছিল তা এখন বছরে ১.৫-২ কোটি লোকসানে চলে।"

তিনি বলছেন, দেশদ্রোহীতার সঙ্গে কোনও আপস নয়। সন্ত্রাসবাদ থেকে মুসলিমদের সরিয়ে চান তাদের উন্নয়ণে সামিল করতে। দাবি করছেন সকলের জন্য সমান বিচারের। নিরলস কর্মে তার দেশ হিতচিন্তায় এলাকাবাসীর কাছে তপন সিকদার এখন 'কাছের মানুষ, কাজের মানুষ।' অন্য দুই প্রার্থী শুধু বাইরের ৪২ সি তাপমাত্রাতেই পুড়ছেন না, ঝলসে যাচ্ছেন প্রখর তপন তাপে।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর আহ্বান

প্রিয় ভাই-ভগিনী, যুবক সাথীবৃন্দ,

নমস্কার,

পঞ্চ দশ লোকসভা নির্বাচনের দামামা বেজে উঠেছে। প্রায় প্রত্যেক পাঁচবছর অন্তর আসা লোকতন্ত্রের এই মহোৎসবের চাঞ্চ ল্য অনুভব করা যাচ্ছে। চারিদিকে প্রথম লোকসভা থেকে চতুর্দ্দশ লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত এক কার্যকর্তা, প্রার্থী ও পার্টি প্রচারক রূপে আপনাদের মধ্যে থাকার সৌভাগ্য আমি পেয়েছি। কিন্তু অসুস্থতার কারণে এইবার ইচ্ছা থাকলেও, আপনাদের মধ্যে থাকতে পারছিনা। তবুও দেশের ভাগ্যের নীরিখে, এই মহত্বপূর্ণ নির্বাচনে চিন্তা এবং চিন্তনে আমিও আপনাদের সঙ্গে আছি।

আমাদের সকলেরই চিন্তা হওয়া স্বাভাবিক যে, আগামী লোকসভার স্বরূপ কেমন হবে। কোন দল বা কোন দলের জোট সরকার হবে। কে প্রধানমন্ত্রী রূপে দেশের নেতৃত্ব করবেন। বন্ধুগণ, আজ আবারও দেশের ভাগ্য রাস্তার তেমাথায় দাঁড়িয়ে। একটি রাস্তা ইউ পি এ সরকারের দিকে যাচ্ছে — যারা পাঁচবছর বিকাশ ও সুরক্ষার দিকগুলিকে অপরাধমূলকভাবে উপেক্ষা করেছে। দ্বিতীয় রাস্তা ওইসব দলগুলির দিকে, যাদের অধিকাংশের প্রবণতা ভাঙ্গাগড়া করে সরকারে ঢুকে পড়ে। এবং তৃতীয় রাস্তা বিজেপি-র নেতৃত্বাধীন এন ডি এ'র দিকে যাচ্ছে, যারা দেশের রাজনৈতিক স্থিরতা বিকাশ, সুশাসন ও সুরক্ষার সঙ্কল্পে অটল। ওদের ছয়বছরের শাসন কালে ওরা এই সঙ্কল্পকে পরিপূর্ণ করে দেখিয়েছে এবং আগামী দিনের এই সঙ্কল্পকে যথার্থরূপ দেবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ । আপনার নির্ণয় দেশের ভবিষ্যত নির্ধারণ করবে। আমার পূর্ণ বিশ্বাস যে, এইবার আপনারা চিন্তাভাবনা করে সঠিক নির্ণয় নেবেন।

বন্ধুগণ, এগারো বছর পূর্বে দ্বাদশ লোকসভার নির্বাচনের পরে আমরা অনেক স্থানীয় দলের সঙ্গে মিশে রাষ্ট্রীয় গণতান্ত্রিক জোটবন্ধন (এন ডি এ) গঠন করেছিলাম। ছ'বছর পর্যন্ত জোটবন্ধন সরকার চলে। তাতে যেমন অস্থির রাজনীতিতে স্থিরতা ফেরে, তেমন বিকাশ দ্রুতগতিতে এগোয়। আমাদের জোটবন্ধন পরস্পর বিশ্বাস ও সম্মানের উপর আধারিত। জোটবন্ধন অসহায়তাতে নয়, মনের মিল থেকে হয়। এই আমাদের এবং অন্যের জোটবন্ধনের পার্থক্য।

★ *আমাদের সরকার সর্বপ্রথম পরমানু বোমার সফল পরীক্ষা করে ভারতকে দুনিয়ার পরমানু শক্তি সম্পন্ন রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে এক সারিতে দাঁড় করায়।*

★ *আতঙ্কবাদের সঙ্গে শক্তিপূর্ণ লড়াইয়ের জন্য কড়া আইন ও নীতি নির্ধারণ করেছিল।*

★ *মূল্যবৃদ্ধি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে রাখে। কোনও জিনিসের কখনও কোনও ঘাটতি হতে দেওয়া হয়নি।*

★ *রাষ্ট্রীয় রাজপথ বিকাশ পরিযোজনা শুরু করে রাস্তার জালবুনে ফেলা হয়।*

★ *গ্রামগুলিতে পাকা এবং বারোমাসিক রাস্তার জন্য 'প্রধানমন্ত্রী গ্রাম-সড়ক যোজনা' শুরু করা হয়।*

★ *মোবাইল বিপ্লব দ্বারা হৃদয়ের দূরত্ব কমিয়ে আনা হয়।*

★ *আমরা সারা দেশের নদীগুলিকে জোড়ার মহত্ত্বকাঙ্খী যোজনা শুরু করি — যাতে খড়ার বিভীষিকা থেকে দেশ মুক্তি পেতে পারে।*

★ *বিকাশের লাভ শহরের সঙ্গে গ্রামে গ্রামেও পৌঁছয়।*

★ *গরীব-কিষাণ এবং মধ্যবিত্ত পর্যন্ত লাভ পৌঁছাতে আমরা চেষ্টার কোনও ত্রুটি করিনি।*

★ *আমরা প্রতিবেশীদের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক স্থাপনে সচেষ্ট ছিলাম কিন্তু ভারতের সুরক্ষা ও সম্মানের মূল্যে নয়।*

এরকম আরো অনেক কাজের কথা বলা যায় যেগুলির সঙ্গে আপনারা পরিচিত।

আমি আপনাদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞ। কারণ অসুস্থতার সময়েও আপনারা আমাকে এত ভালোবাসা ও স্নেহ দিয়েছেন। কিন্তু আমার নিজের স্বাস্থ্যের চেয়েও বেশি চিন্তা আমাদের ভারতের স্বাস্থ্যের জন্য । এর সমাধান আপনাদের দৃঢ় সঙ্কল্প দ্বারাই সম্ভব হতে পারে। এমন এক সঙ্কল্প যা মনোনীত করবে মজবুত নেতা এবং নির্ণায়ক সরকার। যার প্রতিশ্রুতি ভারতীয় জনতা পার্টি দিয়েছে এবং যা শ্রীআদবানীজী সম্পূর্ণ করবেন।

বন্ধুগণ, অনেক বছর থেকে আমার এবং আমার দল তথা সহযোগীদের একই স্বপ্ন কী করে ভারতকে আমরা উন্নত (সশক্ত), সমৃদ্ধ এবং বলশালী বানাতে পারবো। আমার এই যাত্রাপথে অনেক সহযোগী ছিলেন। কিন্তু ওদের মধ্যে সবথেকে অধিক নিকট আর প্রতিভাশালী সহযোগী শ্রী লালকৃষ্ণ আদবানি। ১৯৫২ সাল থেকে আমরা দু'জনে একসাথে কাজ করে আসছি। বিরোধী পক্ষে এবং সরকারে আমরা মিলেমিশে কাজ করেছি। তাঁর বুদ্ধি মত্তা, বৈচারিক স্পষ্টতা আর সকলকে সঙ্গে নিয়ে চলা এবং কার্য সম্পাদন করার কৌশলে আমি মুগ্ধ। ভারতীয় রাজনীতিতে অপ্রতিম যোগদান। বিজেপি আজ যে শীর্ষে পৌঁছেছে তাতে তাঁর বিরাট ভূমিকা। তাঁর নিষ্কলঙ্ক চরিত্র এবং দৃঢ়সঙ্কল্পীত ব্যক্তিত্ব ভারতীয় রাজনীতিতে এক দীপস্তম্ভ স্বরূপ। উনি চ্যালেঞ্জ স্বীকার করে তাকে পরাস্ত করতে দক্ষ। উনি এক মননশীল রাজনেতা। আতঙ্কবাদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াইয়ে এক দৃঢ়চেতা যোদ্ধা। আমি মানি আজ ভারতের জন্য তাঁর মতো রাজনেতারই প্রয়োজন।

ওনার আত্মকথার মুখবন্ধে লিখেছিঃ "এই বইটি বস্তুত এক সংবেদনশীল মানুষ এবং বিশিষ্ট নায়কের উল্লেখ্যনীয় জীবনযাত্রার বৃত্তান্ত, যার সর্বশ্রেষ্ঠ উপলব্ধি এখনও সামনে আসা বাকি আছে।" আমি মনে করি যে, ভারতের প্রধানমন্ত্রীরূপে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ উপলব্ধিগুলি সামনে আসবে। অতএব এই নির্বাচন এক সুবর্ণ সুযোগ।

আমি আপনাদের সকলের কাছে বিশেষ করে আমার যুবক বন্ধুদেরকে এক ভালো এবং আনন্দকারী পরিবর্তনের জন্য আবেদন করছি যে আপনারা আপনাদের সমর্থন, সহযোগ আর ভোট ভারতীয় জনতা পার্টি ও সহযোগী দলগুলিকে দিন। যাতে আদবানীজী ওইসব স্বপ্নকে পূরণ করতে পারেন যা আমরা একসাথে দেখেছি। উনি দেশের শাসনে এক নতুন দিশা দিতে পারেন তথা এসব অসম্পূর্ণ কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন যা বিগত দিনে উপেক্ষা করা হয়েছে। গরীব-ভূখমারী, বেকারী, অসহায়তা-অন্যায় থেকে মুক্ত ভারত বানাতে পারেন। আপনাদের পর্যন্ত এই সন্দেশ পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ শ্রী রাজনাথ সিং এবং অনেক বরিষ্ঠ সহযোগী নেতৃত্বের লাখো কার্যকর্তা নেমে পরেছেন।

আসুন শ্রী আদবানীজীর নেতৃত্বে আগামী সরকার বানানোর এবং ভব্য সুন্দর ভারত নির্মাণ করার দৃঢ় সঙ্কল্প নিই।

ধন্যবাদান্তে

অটল বিহারী বাজপেয়ী

বিজেপি'র কেন্দ্রীয় কার্যালয় কর্তৃক প্রচারিত।

Swastika
4 May - 2009, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registered No. SSRM/Kol. RMS/W.B./RNP - 048/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
L.No. MM&P.O. - SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-021/2007-09

একান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্যের মূল্যও আজ সাধারণের নাগালের বাইরে। সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা ক্রমবর্ধমান মূল্যের সঙ্গে কোনওভাবেই তাল মেলাতে পারছে না। তবুও ওরা বলে চলেছে মুদ্রাস্ফীতি নিম্নমুখী। প্রকৃতপক্ষে বিজেপি পরিচালিত সরকারই নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে বেঁধে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। এটা আমরা আবার করে দেখাব। কেননা, আমাদের প্রতিশ্রুতি শুধু কথার কথাই নয়, কাজই কথা বলেছে এবং বলবে।

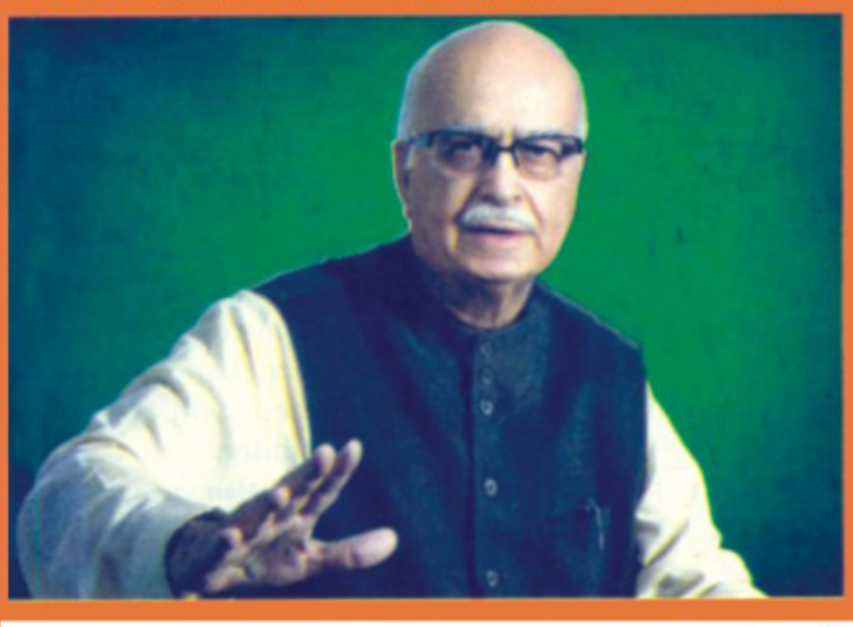

বি জে পি

মজবুত নেতা, নির্ণায়ক সরকার

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, দূরভাষ ঃ ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫, e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com